ক্রশ ফায়ারিং

বেদ রাহী

ক্রশ ফায়ারিং
বেদ রাহী
অনুবাদ ঃ মিহির ভট্টাচার্য্য

সঙ্কোচে পান্ডুর রোদ দ্রুত পাহাড়ের ও পাশে হারিয়ে গেলো আর চার দিকে এমন ত্রস্তভাব ছড়িয়ে পড়তে লাগলো যেন আতঙ্কের ছায়া বুকে বাসা বাঁধছে। বাতাসের দীর্ঘশ্বাস অস্থিরতায় ভরপুর। ঠান্ডার কামড় ছুরি ঢোকার মতো ভেতরে বিঁধে যাচ্ছে। সোমনাথ দুই হাত বগলে চেপে অফিস থেকে বেরোলো। মাথা নিচু করে সে বাড়ির দিকে পা বাড়ালো। ওর পা মাটির ঢেলা আর ছোট ছোট পাথরের টুকরোর ওপর এঁকে বেঁকে পড়ছিলো। ও এমন ভাবে যাচ্ছিলো যেন নিজের অস্তিত্বের হাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করছে।
সিঁড়িওয়ালা গলি থেকে নেমে ও বাজারে এসে পৌঁছলো।
বাজার সুনসান। দুটো কুকুর বিদ্যুতের থামের পাশে চুপচাপ বসে ছিলো। সোমনাথকে দেখে লেজ নাড়তে নাড়তে ওর কাছে চলে এলো। ওরা সোমনাথকে চেনে আর সোমনাথ ওদের। এই মুহূর্তে ওর মনে হলো, ওরা ওকে কামড়ে দেবে। কিন্তু ওরা কোন শব্দ না করে ওর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগলো। সোমনাথ থামলো। ও চায় না যে ওরা ওর সঙ্গে যায়। এই মুহূর্তে ওর এই জানাচেনা প্রাণীদের ওপরও ভরসা নেই। ‘যা ভাগ, যা ভাগ’ বলে ও পা দিয়ে ওদের তাড়াবার চেষ্টা করলো। কুকুর দুটো সরে গেলো। ওরাও বুঝে ফেললো এই মানুষটা নিজের মধ্যে নেই। সোমনাথ এগিয়ে গেলো।
মোড় ঘুরেই ও ওই পাঁচজনকে দেখে খুব ভয় পেয়ে গেলো। ওদের সবাইকে সে খুব ভালো করেই জানে। এই এলাকারই ছেলে। সন্ত্রাসবাদী। সেদিনও ওরা সবাই ওকে কাকু বা ভাই সাহেব ডাকতো। আজকাল ভাট, পন্ডিত অথবা কাফের কিম্বা হিন্দু বলে ডাকে। আবার কোন নামও নেয় না। ‘আরে এই,’‘এই’, ‘এই ব্যাটা’ সম্বোধন করে ডাকে। ওদের একজন ইয়াসিন। ওর ন্যাংটো বয়সের বন্ধু ডাক্তার বসির আহমদের ছেলে। ও ইয়াসিনকে নিজের কোলে নিয়ে কত আদর করেছে। খুবই সৎ শান্ত ছেলে ছিলো। কবিতা পড়া ও লেখারও শখ ছিলো ওর। সে সোমনাথের কাছে আল্লামা ইকবালের কবিতা বুঝতে আসতো। কিন্তু এখন সে সব কথা মনে পড়ে কি না কে জানে। এখন তো ওর চেহারায় ওর পারিবারিক অভিজাত্যের ছাপও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।
দ্বিতীয় ছেলেটি গনি। সরকার ওর মাথার দাম এক লাখ টাকা ঘোষণা করেছে। দেখতে সাদাসিধে। কিন্তু ও কমপক্ষে দশজন হিন্দুস্থানী সৈনিককে মেরেছে। ও সব সময় সামরিক বাহিনীর উর্দি পরে থাকে। সেনা ও পুলিসকে হকচকিয়ে দেয়। সারা বিশ্বের রাজনীতিতে ওর আগ্রহ। আমেরিকার ওপর খুব রাগ। সাদ্দামের অনুগামী। ওর বাবা কাস্টম্‌স্ বিভাগে বড় অফিসার, সেই জন্য ও নিজেদের বাড়িতে থাকে না।
তৃতীয় জন মজিদ। এক নম্বরের শয়তান। চিতার মতো চোখ, মুখভর্তি দাড়ি, কালো টুপি পরে থাকে। ওর মেজাজ উগ্র। বন্দুক ছাড়া কখনোই থাকে না। রাতের বেলায়ও বুকের ওপর রেখে শোয়। সমস্ত অ্যাকশনে আগে থাকা ওর স্বভাব। বহু মানুষের প্রাণ নিয়েছে। কাউকে মেরে ওর কোন অনুতাপ হয় না।
চতুর্থ আলি। চটপটে। সব সময় চনমনে, অস্থির, নিজের বাবাকেও মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে (যদি সে খোচরগিরি করে তাহলে)। শহিদ হয়ে নাম করার বাসনা ওর মনে। জিনস্, শার্ট আর জ্যাকেট পরে থাকে। বন্দুকের বদলে সব সময় একটা গুলিভর্তি পিস্তল কোমরে গুঁজে রাখে। নিশানায় কোন ভুল হয় না।
পঞ্চম জন কাদির। দীর্ঘদেহী, সব সময় অকারণ কথা বলে। চোখ দুটো লাল কিন্তু হিংস্র নয়। ভিতু ও দুর্বলচিত্তের ছাপ রয়েছে। আগে আগে থাকার চেষ্টা করে কিন্তু সব সময় সকলের পেছনে থেকে যায়। ইসলামের নামে ওকে দিয়ে যেকোন কাজ করানো যায়। কথা বলতে বলতে নিজের টুপিটা নিয়ে কসরত করতে থাকে। ও একবার সীমান্ত পেরিয়ে মুজফ্ফরবাদে গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে এসেছে।
ওই পাঁচ জনেরই গভীর বিশ্বাস যে শিগ্‌গিরই কাশ্মীর পাকিস্তানের অংশ হয়ে যাবে আর ওরা সবাই আগামী ইসলামি সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী হবে। এই পাঁচজন বর্তমানে নিজেদেরকে এই এলাকার মোড়ল ভাবে। ওরা যা নির্দেশ দেয় তার বিরোধিতা কেউ করে না। পন্ডিতদের তাড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে ওদেরই হাত রয়েছে। ওদের সম্পর্ক পাকিস্তানী গুপ্তচর ও অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে। ওদের কাছে রাইফেল, কার্তুজ ও হ্যান্ড গ্রেনেড রয়েছে। এদের পরিবারের লোকদের মনে হিন্দুস্থানী সেনাদের প্রতি কোনরকম সমর্থন নেই (বরং ঘৃণাই বেশি) কিন্তু তারা এ-ও চায় না যে তাদের জোয়ান ছেলে, তাদের চোখের মণি, তাদের হৃদয়ের টুকরো এমন এক বিপজ্জনক পথে পা বাড়াক যেখানে প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যু দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তারা কি করবে? ছেলেগুলিকে বোঝাতে বোঝাতে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সোমনাথ এই ছেলেদের সব কথা জানে। এই মুহূর্তে ওরা যে কোন কাজ করতে পারে। সেইজন্যই ওদের এক সঙ্গে দেখে ওর মনে ভয় ঢুকেছে। সোমনাথ ভীত ত্রস্তভাবে ওদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে ওরা তার পিছু নিলো। ঢাল ধরে নামতে নামতে সোমনাথের কানে ওদের পায়ের আওয়াজ আসতে সে কেঁপে উঠলো। পেছন ফিরে দেখলো। ওকে পেছন ফিরে দেখতে দেখে মজিদ ঝট করে বলে উঠলো - ‘আজ রাতে বহু মুজাহিদিন এখান আসবে’। এরপর মজিদ আরো একটু জোরে বললো - ‘ওদের মধ্যে আফগানীরাও থাকবে’।
ওদের উদ্দেশ্য সোমনাথকে ভয় পাওয়ানো। তবে ওরা মিথ্যাও বলে নি। আজ সত্যি সত্যি আফগানীদের আসার কথা এবং হিন্দুস্থানী ফৌজিদের ওপর হামলা করার কথা। ওদের কথা শুনে ভয়ে সোমনাথের বুক আরো শুকিয়ে গেলো।
আলি বললো - ‘বি এস এফ যদি জানতে পারে তাহলে তো ক্রশ ফায়ারিং হবেই। মুজাহিদদের সাহায্য করার জন্য আমাদের তৈরি থাকা দরকার।’
ওরা দেখতে পাচ্ছিলো ওদের কথার প্রভাব সোমনাথের ওপর পড়ছে। কাদির বললো - ‘এই মহল্লার সব মানুষকে বলে দেওয়া উচিত যে তারা যেন ওদের সাহায্য

করার জন্য তৈরি থাকে।’ গনি গলা ছড়িয়ে বললো - ‘ যে ওদের সাহায্য করবে না তাকে বিশ্বাসঘাতক বলে ধরে নেওয়া হবে। তাকে আমরা উড়িয়ে দেবো।’
সোমনাথের মুখের রঙ বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছিলো। হাত-পায়ের শক্তি হারিয়ে যাচ্ছে। এখন ওর মধ্যে এমন সাহসও নেই যে পেছন ফিরে দেখে। শেষ মোড় ঘুরে ও যখন বাড়ির কাছে পৌঁছলো তখন ওই পাঁচ জন থেমে গেলো। ওরা আন্দাজ করে নিয়েছে যে ওদের কথার প্রভাব সোমনাথের ওপর কতখানি পড়েছে। সোমনাথ বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়ালো। কড়া নাড়তে নাড়তে ওর পেছন ফিরে দেখার সাহস হলো। ওর দশ-বারো বছরের ছেলে গোপীনাথ জানলা দিয়ে গলা বার করে বাইরেটা দেখলো। সে সোমনাথকে দেখলো এবং মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা পাঁচ জনকেও। ও ঝটিতি মাথা ভেতরে ঢুকিয়ে নিলো। ‘ড্যাডি এসে গেছে’ বলে ও দরজার শেকল খুলে দিতে দৌড়লো।
দরজা খুলতে সোমনাথ ভেতরে ঢোকার আগে ওই পাঁচ জনের দিকে দেখলো। ওরা সকলে ওর দিকে দেখছে। সোমনাথ ঝট করে ভেতরে ঢুকে গেলো। ওর নিশ্বাস দ্রুত পড়ছিলো। মাথা থেকে টুপি খুলে চুল টানতে টানতে বারান্দায় জুতো খুলে একটা কোণায় গিয়ে বসে পড়লো। ওর মা পদ্মা, স্ত্রী রাধা, দুই মেয়ে জ্যোতি ও দীপ্তি এবং গোপীনাথ ওকে ঘিরে দাঁড়ালো। ওরা শঙ্কিত। সোমনাথ বিড় বিড় করে বলতে লাগলো- ‘আর আমরা এখানে থাকতে পারবো না। এলাকার সব ছেলে, ছেলে নয় সন্ত্রাসবাদী আমার পেছনে লেগেছে। ওরা আমাদের তাড়িয়ে দম ফেলবে।’ ওর মা ওর পাশে বসতে বসতে বললো-‘ওরা ভাবছে সব পন্ডিতই তো এখান থেকে চলে গেছে, একমাত্র আমরাই বা কেন টিকে রয়েছি।’
‘হয়তো তা-ই’, সোমনাথ বললো, ‘ওরা আমাদের স্বস্তিতে বসতেও দেবে না। কাল রাতের মতো আজও পাথর ছুঁড়বে।’ ওর স্ত্রী রাধা ঝাঁজিয়ে বললো, ‘এই গুন্ডাগুলো এটুকুও ভাবে না যে আমরা কোথায় যাবো। আমরা গরিব। মাথার ওপর ছাদও পাবো না।’
‘ওরা আমাদের নিয়ে কেন ভাববে?’ সোমনাথ ঝাঁজের সঙ্গে বললো।
‘এই ছেলেগুলোর যে কি হয়েছে! আগে তো কখনও ওরা এ ধরণের ঝামেলা করতো না’। এই কথা বলতে বলতে পদ্মা মানোভার থেকে বাটিতে চা ঢেলে সোমনাথকে দিলো। ‘আমাদের এবার এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত’ বলতে বলতে সোমনাথ চায়ে চুমুক দিলো। ঠিক সেই সময় বাইরে দরজায় কে কড়া নাড়লো। সবাই শঙ্কিত হলো। ছেলেমেয়েদের চেহারার রং সাদা হয়ে গেলো। সবাই চুপ।
দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ আবার এলো। সোমনাথ চায়ের পাত্র এক পাশে রাখলো আর কাঁপা কাঁপা পায়ে উঠে দাঁড়ালো। আবার খট খট আওয়াজ শোনা গেলো। ও ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলো। সবাই ওর পেছনে পেছনে পা ফেললো। ও ওদেরকে ওখানেই থামার ইশারা করলো । সবাই থেমে গেলো। ও নিজে দরজার দিকে এমনভাবে এগোতে লাগলো যেন মৃত্যুর মুখে এগোচ্ছে।
দরজার কাছে পৌঁছে ওর সাহস আরেকবার উবে গেলো। ও দরজার মাঝখান দিয়ে উঁকি মেরে দেখলো, কিছুই নজরে এলো না। শেষ মেষ ওকে দরজা খুলতেই হলো।
ওর শালা রাজনাথ কোনরকম কুশল বিনিময় না করে ভেতরে ঢুকে শেকল লাগিয়ে দিলো। ওকে দেখে সকলের প্রাণ ফিরে এলো। সবাই পিছিয়ে এলো। রাজনাথ এগোতে এগোতে বললো, ‘আমরা বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া ঠিক করেছি। একটা ট্রাকের বন্দোবস্ত করেছি। ভোর পাঁচটার সময় আমরা বেরিয়ে পড়বো যাতে গ্রামের কেউ টের না পায়।’
পদ্মা জিজ্ঞেস করলো - ‘যাবে কোথায়?’
‘জম্মু’।
‘ওখানে থাকবে কোথায়?’
আগে কীর থেকে তো বেরোই, একটা না একটা উপায় হবেই। শুনেছি এখান থেকে যারা যাচ্ছে তাদের জন্য সরকার জম্মু শহরের বাইরে নাগরৌটায় ক্যাম্প বানিয়েছে।’
‘নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে সেখানে থাকবে কি করে? করবে কি?’ পদ্মার মনে এখনও খটকা।
‘প্রাণ বাঁচলে কিছু না কিছু করে নিতে পারবো’। কিছুক্ষণ পরে রাজনাথ আবার বললো, ‘ কে ভেবেছিলো যে নিজের ঘরবাড়ি ছাড়তে হবে। আমি তো কীরের বাইরে একবারই মাত্র পাঠানকোট অবধি গিয়েছিলাম। এখন পুরো পরিবার নিয়ে যেতে হবে। ট্রাকওয়ালা পাঁচ হাজার টাকায় রাজি হয়েছে। যদি তোমরাও যাও তাহলে আধাআধি করে নেওয়া যাবে।’
সোমনাথ বললো, ‘আমিও যাওয়া স্থির করেছি। মেয়েদের জন্য বড় ভয় করে। এই এলাকার পন্ডিতদের মধ্যে আমরাই এক ঘর থেকে গেছি। সন্ত্রাসবাদীরা ভয় দেখাতে , হুমকি দিতে শু করেছে।’
‘তাহলে তো তোমার অবশ্যই ছেড়ে যাওয়া উচিত’ - রাজনাথ বললো। তার বোন রাধা আর চুপ থাকতে পারলো না, বললো, ‘আমাদের যাওয়া অত সহজ নয়।’
‘কেন?’
‘আমাদের কাছে তো ট্রাকওয়ালাকে দেওয়ার মতো পয়সা নেই। এ তো মাত্র তিন মাস আগে নতুন চাকরিটা পেয়েছে। তার আগে দু বছর বেকার বসে ছিলো। ঘরে যা কিছু ছিলো সব শেষ। এখন তো আমাদের কাছে একটা কানাকড়িও নেই। যদি কিছু থাকতো তাহলে তো আমরাও কবে চলে যেতাম।’
ঠিক আছে, আমি ট্রাকের টাকা নেবো না। তুমি আমার বোন, তোমার জন্য এটুকু করতেই পারি। এখন আর তোমাদের এখানে থাকা ঠিক নয়।’
পদ্মা বললো, ‘তবু আমার মন বলছে যে আমাদের এখান থেকে যাওয়া উচিত নয়।’
‘ কেন?’ রাজনাথ জিজ্ঞেস করলো।
ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরে দরজায় করাঘাত হলো।
সবাই চমকে উঠলো। হৃৎপিন্ডের ধুকপুকানি থেমে গেলো।
সোমনাথ কাঁপতে কাঁপতে দরজার দিকে এগোলো। বাকি সবাই ওকে দেখছে। ও দরজার ফাঁক দিয়ে দেখার চেষ্টা করলো কিন্তু কিছুই দেখতে পেলো না। দ্বিতীয়বার খট্‌খট্‌ আওয়াজ হলো। ওকে শিকল খুলতেই হলো।
গুলাম রসুল দ্রুত ভেতরে ঢুকে শিকল তুলে দিলো। কান-ঢাকা টুপি আর লম্বা সাদা দাড়িতে ওকে অদ্ভুত লাগছিলো। ওর চোখ দুটিতে আতঙ্কের ছাপ। শরীর কাঁপছিলো। ও সোমনাথের বাবার গলায় গলায় বন্ধু ছিলো। এই পরিবারে ওকে সর্বদা মান্য গুজন হিসেবে দেখা হয়।
‘চাচাজী, আপনি?’ সোমনাথ হতচকিত হয়ে বললো।
‘আমাকে আর চাচা ডেকো না,’ গুলাম রসুল কাঁদো কাঁদো স্বরে বললো, ‘ তোমার মুখে চাচা ডাক শুনে আজ আমার লজ্জা হচ্ছে। কি হয়ে গেলো সব? আগুন ধরে গেছে। ভাই ভাইয়ের শত্রু হয়ে গেছে,’ এই কথা বলে সে পদ্মাকে দেখে তার দিকে তাকিয়েই রইলো। ওর চোখে জল এসে গেলো। তারপর তার কাছে গিয়ে বললো, ‘ভাবী, তুমি তো জানো আজ ষাট বছর ধরে আমি তোমাকে মায়ের পেটের ভাইয়ের বৌয়ের চেয়ে বেশি মর্যাদা দিয়ে এসেছি। বৃজনাথ আমার ন্য

াংটো বয়সের বন্ধু ছিলো। ওর মৃত্যুর পরও তোমার আমার সেই সম্পর্ক অটুট ছিলো। ও আমার থেকে অনেক বেশি ভাগ্যবান। আমার আগে চলে গেলো। ওর এমন দিন দেখতে হলো না। এমন দিন দেখার জন্য বুকের পাটা থাকা দরকার।'

সবাই ওর দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে ছিলো। মনে হচ্ছিলো, ওর মধ্যে পাগলামি দেখা দিয়েছে। ওর মুখ থেকে শব্দগুলো টুকরো টুকরো হয়ে বেরিয়ে অ াসছিলো। ও বলে যাচ্ছিলো, 'এখন আমি তোমাদের বলতে এসেছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমরা এখান থেকে চলে যাও। আগে আমি ভাবতাম, আমি তোমাদের রক্ষা করতে পারবো না। এই দিশেহারা ছেলেগুলো যদি খবর পায় যে আমি এখানে এসেছি তাহলে ওরা হয়তো আমাকেই গুলি মেরে দেবে। মানুষ গুলির থেকেও সস্তা হয়ে গেছে। ভগবানের ভয় সবার মন থেকে চলে গেছে। ওর ওপর আমারও আর ভরসা নেই। আমি অধর্মী হয়ে গেছি।' এই বলে গুলাম রসুল কঁ াদতে লাগলো। ফের নিজের চোখের জল মুছতে মুছতে বললো, 'আমি সারা জীবন ধরে পাঁচ ওয়ক্ত নমাজ পড়ে আসছি কিন্তু আজকে আমার প্রতিবেশীদের রক্ষা করতে পারি না। বৌদি, আমাকে মাফ দিও, আমি নিপায়। আমি চলি। শুধু এটুকুই বলতে এসেছিলাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমরা এখান থেকে চলে যাও। খুদা হা ফিজ।' সবাই স্তম্ভিত। গুলাম রসুল চোখের জল মুছতে মুছতে বাইরে চলে গেলো। সোমনাথ দরজা বন্ধ করলো। তারপর রাজনাথের কাছে গিয়ে বললো, 'রাজন াথ তুই যা। আমরা ভোর পাঁচটার আগেই তোদের গ্রামে পৌঁছে যাবো।'

'ঠিক আছে,' রাজনাথ এই কথা বলে দরজার দিকে পা বাড়ালো। ফের একবার ওদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখলো, বললো, 'আবার মত বদলিও না। হয়তো তোম াদের এটাই শেষ সুযোগ। ভগবানের ওপর ভরসা রাখো। টিজি দেওয়ার মালিক সে। এখানে দিলে ওখানেও দেবে।'

রাজনাথ চলে যাওয়ার পর সোমনাথ বললো, 'নাও, নাও, এখন থেকেই তাড়াতাড়ি সব গুছিয়ে নাও। হাতে বেশি সময় নেই।' সবাই তাড়াতাড়ি করে ভেতরের ক ামরায় ঢুকলো। ভেতরে ঢুকে প্রত্যেকে হতভম্বের মতো একে অপরের দিকে দেখতে লাগলো। এইভাবে যাওয়ার জন্য গোছগাছ করা এমন এক কাজ যার কথা ওরা কোনদিন ভাবেওনি।

'কি কি নিতে হবে?' রাধা জিজ্ঞেস করলো। সোমনাথ উত্তর দিলো, 'যা কিছু নিতে চাও সেসব নিজে নিজেই বইতে হবে। অন্ধকারের মধ্যে বাড়ি ছাড়তে হবে আর এমনভাবে ছাড়তে হবে যাতে কেউ টের না পায়।'

' তোমরা সবাই যাও। আমি এখানেই থাকবো।' পদ্মার কথা শুনে সবাই হতবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো।

'এ তুমি কি বলছো মা?' সোমনাথ ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

'আমি এখানেই থাকবো।'

'কিন্তু কেন?'

'আমি এখানেই মরতে চাই।'

'মা, এখান থেকে গেলে আমরা বেঁচে যাবো।'

'আমি কার হাত থেকে বাঁচবো? এখান থেকে গিয়েও আমি বেশি দিন বাঁচবো না। মরার জন্য অন্য কোথাও আমি কেন যাবো? আজ ষাট বছর যে বাড়িতে আমি ক াটিয়েছি আমি সেখানেই মরবো।'

সোমনাথের বুকের মধ্যে হাহাকার করে উঠলো। ও বুঝে উঠতে পারছিলো না যে মাকে কিভাবে বোঝাবে। মায়ের হাত ধরে ও বললো, 'মা তোমাকে একা রেখে আমরা কি করে যাবো?' পদ্মা বললো, ' খোকা, আমি তোমাদের সঙ্গে গেলে আমার দেখাশোনা করতেই তোমাদের ব্যস্ত হতে হবে। আমার এই বুড়ো হাড়ে পালাব ার সময় তোমাদের সঙ্গে তাল রাখতে পারবো না। বিদেশ বিভুঁইয়ে আমার প্রাণ গেলে আমার লাশও তোমাদের কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে।'

সকলের বুকে পাষাণ নেমে এলো। সোমনাথ কাঁদতে লাগলো। নিজেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, 'অমন কথা বলো না মা। যদি তুমি না যাও তাহলে আমরাও কেউ যাবো না। আমরা সবাই একসঙ্গেই এখানে মরবো।' এই বলে এক কোণায় গিয়ে মুখ লুকিয়ে সামান্য শব্দ করে কাঁদতে লাগলো। পদ্মা ধীর পায়ে ওর কাছে গেলো। নিজের চোখের জল মুছে ওর মাথায় হাত বোলাতে থাকলো। সোমনাথ আরো শব্দ করে কেঁদে উঠলো। পদ্মা বললো,' খোকা, তুই বোঝার চেষ্টা কর। আমার জীবন আমি ভোগ করেছি। তোকে এখনও বাঁচতে হবে। নিজের সন্তানদের জন্যেই তোকে বাঁচতে হবে। তোর নিজের দায়িত্ব পালন করতে হবে। আমার জন্যে চিন্তা করিস না, সন্তানদের কথা ভাব। তোর মেয়েরা বড় হচ্ছে। তুই জানিস না, তখন তুই খুব ছোট। সেই সাতচল্লিশ সালে যখন উপজাতিদের হামলা হয়েছিলো। ওরা কী অত্যাচারই যে করেছিলো। ওরা মেয়েদের সঙ্গে রাক্ষসদের মতো ব্যবহার করেছিলো। তোর শালা রাজনাথ ঠিকই বলেছে যে পরে এমন সুযোগ জুটবে কি না কে জানে। বাচ্ছাদের নিয়ে তুই বেরিয়ে পড়।'

'আমি তোমাকে একা রেখে যাবো না মা।' সোমনাথ যেন কোন রায় জানিয়ে দিলো। সবাই চুপ। কারো মাথায় কোন বুদ্ধি খেলছিলো না। বাচ্চারাও থম মেরে গেছে। রাধা কিছু একটা ভেবে এগিয়ে এসে বললো, 'যদি আপনারা না যান তাহলে ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমি আমার ভাইয়ের সাথে চলে যাবো।'

'কি বললে? ' রাধার কথা শুনে সোমনাথ আরো অস্থির হয়ে বললো, 'তুমি ওখানে গিয়ে পথে দাঁড়াবে, সঙ্গে ছেলেমেয়েরাও।'

'প্রাণে বাঁচলে কোন না কোন রাস্তা বেরোবেই।'

'ও ঠিক বলছে,' পদ্মা বললো, 'প্রাণ বাঁচলে টিজির উপায় হয়ে যাবে। আমি তোমাদের এখানেথাকতে দেবো না। তোমার নিজের সন্তানদের কথা ভাবতে হবে। তুমি ওদের বাবা। ওদের প্রতি কর্তব্য থেকে তুমি মুখ ঘুরিয়ে নেবে কি করে?'

অকস্মাৎ গুলির আওয়াজ এলো। সবার হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেলো।

পদ্মা কাঁপা কাঁপা স্বরে বললো,'আজ আবার ক্রশ ফায়ারিং হচ্ছে।' সোমনাথ বলতে লাগলো, 'ওই ছেলেগুলো ঠিকই বলেছে, হয়তো আফগানীরাই এসেছে আর বি-এস-এফরা সে খবর পেয়ে গেছে।' পদ্মা রান্নাঘরের দিকে এগোতে এগোতে বললো,' তোমরা যাওয়ার জন্য তৈরি হও। আমি তোমাদের জন্য ভাত রাঁধছি। সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্যও তো কিছু খাবার লাগবে।' সোমনাথ আবার আবদার করলো, 'তুমিও তৈরি হয়ে নাও মা।'

' জেদ করো না।' পদ্মা রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বললো।

গুলি চলার শব্দ ভেসে আসছিলো। ছোটরা পরস্পরের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। রাধা দ্রুত কিছু জিনিসপত্র এক জায়গায় জড়ো করতে লাগলো। আচমকা গলি দিয়ে কিছু লোকের দৌড়ে পালাবার আওয়াজ শোনা গেলো। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সোমনাথ জানালার দরজা সামান্য খুললো। বাইরে দেখবার চেষ্টা করলো। দৌড়ে পালাতে পালাতে দুজন লোক ওই জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো। দুজনেরই নিশ্বাস দ্রুত পড়ছিলো। তারা নিজেদের মধ্যে ফিস ফিস করে কথা বলছে। কাদির বলছিলো, 'এখানে দাঁড়ানো ঠিক হবে না। সোমনাথ আমাদের কথা শুনে ফেলতে পারে। চলো ওদিকে যাই।' মজিদ বললো, 'তুমি ঠিক বলেছো। চলো যাই। ' দুজনে ওখান থেকে চলে গেলো।

সোমনাথ জানালা ছেড়ে সরে এলো। ওদিকে কাদির আর মজিদ কথা বলতে বলতে সতর্কতার সঙ্গে এগোতে লাগলো, 'এই সোমনাথ যে কবে নিজের বাড়ির লে াকদের নিয়ে এখান থেকে কেটে পড়বে কে জানে। ওর বাড়িটা খালি হলে আমাদের ঘাঁটি হতে পারে।' কাদিরের কথা শুনে মজিদ বললো, 'আর কিছু দিনের মধ্যে

না গেলে চুপচাপ ওদের নিকেশ করে দেবো।' ওরা কথা বলতে বলতে ইয়াসিন, গনি আর আলি যেখানে আগে থাকতে জড়ো হয়েছিলো সেখানে পৌঁছে গেলো। বিরক্ত গনি বলছিলো, 'আমি আগেই বলেছিলাম যে, আফগান মুজাহিদদের আজ ডেকো না। দুজন শেষ হয়ে গেলা তো?' উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে আলি বললো, 'আমাদের দুজন আমাদের কাছে দুহাজার জনের সমান। আমাদের লোক তো অত নেই, কয়েকশো মাত্র আর আমাদের লড়তে হচ্ছে হাজার হাজার হিন্দুস্থানী ফৌজির সঙ্গে। তবে ওরা জানে না যে আমাদের সঙ্গে আল্লা আছে।' কাদির নিজের টুপি ঘোরাতে ঘোরাতে বললো,' জিহাদ করলে সংখ্যা দেখতে নেই আর এ -ও দেখতে নেই যে ওদিকে কত আছে আর এদিকে কত আছে। সারা পৃথিবী দেখছে সাদ্দাম কিভাবে আমেরিকার বাপের নাম ভুলিয়ে দিয়েছে।'
ঠিক এমন সময় ইয়াসিন একটা আওয়াজ শুনতে পেলো। 'চুপ, শোনো কিসের আওয়াজ আসছে।' সবাই কান খাড়া করে শুনতে লাগলো। ভালো করে শোনার জন্য জানালার দিকে এগোলো। অন্ধকারে কিছু বোঝা যাচ্ছিলো না। তবু ফৌজি জুতোর আওয়াজ শোনা যাচ্ছিলো।
' সেনা আসছে,' ইয়াসিন বললো। আলি উত্তেজিত হয়ে বললো, 'চলো আমাদের বন্দুক বার করি।' ইয়াসিন ওকে থামালো, 'পাগল হয়েছো না কি! একটু আগেই দুজন আফগান খতম হয়েছে।' গনি বললো, 'ও ঠিকই বলছে। এখন ধীরস্থিরভাবে যা কিছু করার করতে হবে।' মজিদ দাঁতে দাঁত ঘষে বললো, 'সব সময় ধৈর্য ধরো, সব সময় ধীরস্থির হও। ধৈর্যেরও তো একটা সীমা আছে। আমার কথা শোনো, বাইরে এখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। দু-চারটে ফৌজিকে আমরা গুলি মেরে উড়িয়ে দিতে পারবো। ওরা আমাদের কিছুই করতে পারবে না। আমাদের উচিত আমাদের মুজাহিদদের শহিদ হওয়ার বদলা নেওয়া।'
কাদির বললো, 'আমরা ধরা পড়বো না, সেটা ঠিক। কিন্তু ওরা বাড়ি বাড়ি ঢুকে পড়ার একটা অজুহাত পেয়ে যাবে। তালাশি নিতে শু করবে। মেয়েদের বাচ্চাদের এই ঠান্ডায় বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবে।' ইয়াসিন ওকে সমর্থন করে বললো,' এই সময় আমাদর উচিত চুপচাপ নিজেদের বাড়ি ফিরে যাওয়া। সেনারা এখন হয়তো ঢাল অবধি এসেছে, চলো সরে যাই।'
আলি রেগে গিয়ে বললো, 'ইয়াসিন, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় তুমি খুব ভীতু।'
'আমি? আমি ভীতু?' ইয়াসিন চেঁচিয়ে উঠলো, 'পরে বুঝতে পারবে যে, আমি তোমাকে বাঁচিয়ে দিচ্ছি।' গনি এগিয়ে এসে বললো, 'ইয়াসিন বহু বার আমাদের নেতৃত্ব দিয়েছে, আমাদের বাঁচিয়েছে। এ কথা সকলকেই মানতে হবে।'
'আমাদের নিজেদের অবস্থাও বুঝতে হবে,' কাদির বললো, 'নিজেরা এত বড় শক্তির সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছি।' তারপর ও কান খাড়া করে সেনাদের জুতোর আওয়াজ শুনে বললো, 'খুব কাছাকাছি এসে গেছে মনে হচ্ছে। চলো আমরা চলে যাই। ওরা সব সময় এখানে একবার ঢুঁ মারে।' সবাই ওখান থেকে সরতে লাগলো। ইয়াসিন গনিকে হাত ধরে থামিয়ে বললো, 'তুমি তোমার বাড়ি তো যেতে পারবে না তাই সোজা তোমার আশ্রয়ে চলে যাও। আমি তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসছি। সেই সঙ্গে তোমার খাবার নিয়ে তোমার ওখানে যাবো।'
আমি আজ মায়ের সঙ্গে নিজে দেখা করবো। ওখানেই খেয়ে নেবো।'
'খুব সতর্কভাবে যেও। ফৌজিরা তোমার খোঁজে আছে।'
'চিন্তা করো না।'
' তোমাকে নিয়েই আমার সব থেকে বেশি চিন্তা। সেনারা তোমার জন্যই এখানে সব জায়গায় হানা দিচ্ছে। তোমার মাথার দাম উসুল করতে চাইছে।' গনি পকেট থেকে টুপি বার করে মাথায় পরতে পরতে বললো, 'আমার মাথা অত সস্তা নয়। এখনও অবধি আমি মাত্র দশটা কাফেরকে মেরেছি। আমার এখনও অনেক কিছু করার আছে। আমার মাথার দাম আরো বাড়বে।' দুজনে কথা বলতে বলতে অন্য ছেলেদের পেছন পেছন চলতে লাগলো। প্রথমে সকলে আন্দাজ করে নিলো সৈনিকরা কোন দিক থেকে আসছে। ওরা উলটো দিকের গলিতে ঢুকে পড়লো। টহল দিতে দিতে সৈনিকেরা ভুট্টার খেতের কাছে পৌঁছে গেছে। ওদের হাতে গুলিভর্তি রাইফেল। ওদের জুতোর ঘায়ে পাথরের হৃদয়ও কুঁকড়ে রয়েছে। গাছের ডালে কাকেরা নিজেদের বাসার মধ্যে সামান্য নড়াচড়াও করছে না। পাখিরা যেন নিজেদের দম বন্ধ করে রয়েছে। কাঠবিড়ালীরা নিজেদের লেজ নিজেদের মুখে ঢুকিয়ে রেখেছে। ঘরের মধ্যে লোকেরা লেপের তলায় কাংড়ি নিয়ে আরো কুঁচকে গেছে। সেনাদের জুতোর আওয়াজ চাবুকের সপসপানির মতো শোনাচ্ছিলো।
গুলাম রসুলের ঘুম আসছে না। ওর হাত-পা সবসময়ে কাঁপে। ওর খালি মনে হয়, কেয়ামত এসে গেছে। সব সময় বিড় বিড় করে। এখনও সে জানালা দিয়ে ঝুঁকে বাইরে তাকিয়ে সেনাদের টহল দেওয়া দেখছিলো। সেনারা গলি পেরিয়ে গেলে অল্প খোলা জানালার পাল্লাও বন্ধ করে দিলো। ওর স্ত্রী উনুনের পাশে বসে কাংড়ির কয়লার আঁচ উসকে দেওয়ার চেষ্টা করছিলো। গুলাম রসুল তার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো, 'ইয়া আলালা, বাইরে কী অন্ধকার, কিছুই নজরে পড়ছে না। অন্ধকার চিৎকার করছে, সব গলিতে, সব হৃদয়ে।' ওর স্ত্রী আজিজী ওর দিকে তাকাচ্ছিলো না। শুনছিলো ঠিকই। ওরা দুজন নিঃসঙ্গ। একজন আরেক জনের সঙ্গী। কতদিন ওরা একে অপরের দিকে না তাকিয়ে সারা রাত কথা বলে কাটায়। গুলাম রসুল বলে যাচ্ছিল, 'আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমার বোধভাষ্যি গুলিয়ে গেছে। এ কী হলো? এই কেয়ামত কি ভাবে এলো? মানুষ শয়তান হয়ে গেলো? মন থেকে ভগবানের ভয় চলে গেছে? তুমি জানো পন্ডিতদের পুরাণে আছে যে অতীতে এই পুরো উপত্যকা জলে থই থই ছিলো, একটা বিলের মতো। জল শুধু জল। এখন অন্ধকার, শুধু অন্ধকার।'
'আমার তো এই অন্ধকারে দম বন্ধ হয়ে আসছে,' আজিজী বললো, 'সকলেই একে অন্যকে ভয় পাচ্ছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না।'
' সেইজন্যেই আমি সোমনাথকে বলে এসেছি ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে যাও। এখন আমি আর তোমাদের রক্ষা করতে পারবো না।' আজিজী কাংড়িতে ফুঁ দিতে দিতে বললো, 'ওরা আমাদের ছেলেগুলোর ওপর কী অত্যাচারই না করেছে!'
ওর কথা শুনে গুলাম রসুল চমকে উঠলো, 'ওরা? তুমি কাদের কথা বলছো? সোমনাথ কি আমাদের ছেলেদের মেরেছে? যেসব পন্ডিত ঘর ছাড়া হয়েছে তাদের কি দোষ? তোমার মাথায় বিষ ঢুকেছে। সোমনাথ তো আমাদেরই ছেলে। আজ ওর মতো অত্যাচার সইতে হচ্ছে কাকে? গরিব মানুষ। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে অজানা জায়গায় চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। নিজের বুড়ি মাকে দেখাশোনা করতে পারবে কি না কে জানে? ও মেরে খোদা! তুমি ওদের ওপর তোমার কণার ছায়া দিও।' এই কথা বলে সে প্রার্থনার ভঙ্গিতে নিজের দুটো হাত ওপরে তুলে ধরলো। ওর চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগলো। ও ঐকান্তিক প্রার্থনা করছিলো যাতে ওর ন্যাংটো বয়সের বন্ধু বৃজনাথের ছেলে এখান থেকে গিয়ে যেখানেই থাকুক যেন নিরাপদে থাকে।
ফৌজি সেপাইরা এ সময় সোমনাথের বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছে। জানালার ফাঁক দিয়ে ও জুতোর লাফ দিয়ে যাওয়া দেখছিলো। অন্ধকারে ভালো দেখা যাচ্ছে না তবু তাদের শব্দে দেওয়াল, ছাদ নাড়িয়ে দিচ্ছিলো। যখন তারা ওখান দিয়ে চলে গেলো এবং তাদের আওয়াজ অন্ধকারে ডুবে যেতে লাগলো তখন সোমনাথ জানালা থেকে সরে গিয়ে বাড়ির অন্য সবাই যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো সেখানে চলে এলো। সামান্য জিনিসপত্র যা ওরা নিয়ে যাবে কাছেই পড়ে ছিলো।
পদ্মা বললো, ' সেনাদের ভয়ে সবাই ঘরে ঢুকে রয়েছে। এই সময় তোমরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ো। ' সোমনাথ কাতর স্বরে বলে উঠলো, 'মা, এদের ওখানে একটা ব্যবস্থা করেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি তোমাকে নিতে আসবো। চিন্তা করো না।' পদ্মা অতি কষ্টে নিজের চোখের জল ধরে রেখেছিলো। সে শুধুমাত্র একটুকুই বলতে পারলো, 'কথা বলে সময় নষ্ট করো না। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ো।'
সবাই কিছু কিছু জিনিস তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগোলো। পদ্মা খাবারের পুঁটলিটা রাধার হাতে দিলো। সোমনাথ সজল চোখে মায়ের দিকে তাকালো। পদ্মা ত

ার কাঁধে হাত রেখে বললো, ' খোকা , কিছু ভাবিস না। এখানে আমার কোন বিপদ হবে না। অবস্থা একটু পালটালেই এখানে চলে আসিস। ওখানে তোর অনেক দায়িত্ব। চিঠি লিখিস। যা, এখন বেরিয়ে পড়।'

সোমনাথ দরজা খুলে আরো একবার মায়ের দিকে দেখলো। পদ্মা ওর মাথায় চুমু খেয়ে বললো, 'যা, আর পেছন ফিরে তাকাস না। আমার শুধু শরীরটাই এখানে রইলো, মনটা তোদের সঙ্গেই থাকবে। যা, ভালো থাকিস।'

এক এক করে সকলেই বাইরের অন্ধকারে হারিয়ে গেলো।

পদ্মা দরজায় দাঁড়িয়ে রইলো। গাছের ডাল একের পর এক যেমন কেটে নেয় তেমনি সকলে ছেড়ে যাচ্ছে। ও মন শক্ত করে নিয়েছিলো। শুকনো চোখে ও সব দেখছিলো। ও পাথর হয়ে গেছে। ওর মনে হলো ও পড়ে যাবে। কোনরকমে দরজার পাল্লা ধরে নিজেকে সামলালো। দ্রুত ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো। ভেতরে ঢুকতেই ওর বাঁধ ভেঙ্গে পড়লো আর ও ঝর ঝর করে কাঁদতে লাগলো। কান্নার আওয়াজ বেড়ে যেতেই ও দুহাত দিয়ে মুখ চেপে ধরলো। অনেকক্ষণ সে ওই ভাবে কাঁদলো। কান্না বন্ধ হলে ওর নিজেকে ভীষণ একা মনে হলো। ও চার দিকে দেখলো। ওর সব কিছু ফাঁকা ফাঁকা মনে হলো। ওর চোখে হতাশার ছায়া, দম বন্ধ, ও কেঁপে উঠলো। ওর মনে হলো এই নিষ্ঠুর নিঃসঙ্গতার মধ্যে ও বেশি দিন বেঁচে থাকতে পারবে না। কাঁপা কাঁপা পায়ে ও বিছানার দিকে এগোলো। বিছানায় পৌঁছেই ও তাড়াতাড়ি লেপের তলায় ঢুকে এমন ভাবে জড়োসড়ো হয়ে শুলো যেন কেউ ওকে গলা টিপে মারতে আসছে।

প্রতিদিনের মতো ভোর হলো। প্রতিদিনের মতো দুধের পাত্র হাতে নিয়ে রমজান দুধ দিতে এসে দরজায় খটখট করলো। ও অবাক হলো। কাল পর্যন্ত তো দরজায় প্রথম ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে যেতো আর আজ এতবার কড়া নাড়ার পরও খুলছে না। বারবার খট খট করার পরও যখন কেউ দরজা খুললো না তখন ওর মনে আশঙ্কা হলো ও আরো জোরে জোরে কড়া নাড়তে লাগলো। ও ঘাবড়েও গেলো। দুধের পাত্র হাতে শক্ত করে ধরে ও ওখান থেকে পালালো। ঢাল পেরিয়ে ও আলির বাড়ি র সামনে এলো।

'আলি, এই আলি।'

আলি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কি ব্যাপার ?'

'নিচে আয়। তাড়াতাড়ি।'

আলি বুঝলো বিশেষ কোন ব্যাপার আছে। ও জানালা বন্ধ করে দিলো। রমজানের ঘাবড়ানো কাটে নি। ও নিচে অপেক্ষা করতে লাগলো। ও দেখলো, পাত্র থেকে খানিকটা দুধ ছলকে পড়ে গেছে। কোমরে পিস্তল গুঁজতে গুঁজতে আলি বাইরে এলা। রমজান বললো, 'চল তাড়াতাড়ি। আমার মনে হচ্ছে সোমনাথ পন্ডিতদের বাড়ির সকলেই চলে গেছে। ' 'চল তো দেখি,' আলিও ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে বললো, 'যাওয়ার পথে ইয়াসিন, মজিদ আর অন্য সবাইকেও ডেকে নেবো।' এর আগেও একবার এরকম খবর দিয়েছিলো রমজান। সেবার কাশীনাথ নিজের পরিবার নিয়ে এরকমই রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গিয়েছিলো।

ইয়াসিন, মজিদ, গনি, কাদির এবং আলি এক সঙ্গে জড়ো হয়ে সোমনাথের বাড়ির সামনে পৌঁছলো। সকলেরই বুকের ধুকপুকানি বেড়ে গেছে। ওরা তো কবে থেকেই চাইছিলো যে এই বাড়িটা খালি হয়ে যাক। গনি দরজার কড়া নাড়তে লাগলো। কিন্তু কেউ শেকল খুললো না। ' ভেতর থেকে শেকল লাগানো। ' কেউ না কেউ তো আছেই,' এই কথা বলে ও আবার কড়া নাড়তে লাগলো।

বৃদ্ধ গুলাম রসুল আর ইয়াসিনের বাবা ডাক্তার বসির আহমদও ওখানে হাজির হলো। দোকানি সামাদ জু গরম জামার নিচে কাংড়ি চেপে ধরে উপস্থিত। এক পাশে কয়েকজন মহিলাও উঁকিঝুকি দিতে লাগলো।

এবারে গনির সঙ্গে আলিও দরজায় ধাক্কা দিতে শু করলো।

'আজব ব্যাপার,' মজিদ কাঁধের ওপর বন্দুক রাখতে রাখতে বললো, 'পরিবারের সবাই মিলে আত্মহত্যা করে বসে নি তো!'

'কী আবোল-তাবোল বকছো!' ইয়াসিন বললো।

'তাহলে কি হয়েছে ? ভেতর থেকে দরজা বন্ধ কেন ?' আলি জিজ্ঞেস করলো। সবাই চুপ হয়ে গেলো।

ওই নৈঃশব্দ গনি ভাঙলো, 'এসো সবাই মিলে ধাক্কা দেই। শেকল ভেঙে যাবে।'

'দাঁড়াও', ইয়াসিন পরামর্শ দিলো, 'ওই যে ভাঙা থামটা পড়ে আছে ওটা দিয়ে দরজায় মারি।'

চারজনে মিলে পোলটা তুলে আনলো।

আশপাশে ততক্ষণে আরো লোক জড়ো হয়েছে যেন কোন তামাশা হচ্ছে। ওরা চারজন যে-ই থামটা তুলে দরজার দিকে পা বাড়ালো অমনি হঠাৎ শেকল খোলার আওয়াজ এলো। ওরা থেমে গেলো। সবাই দেখলো দরজা খুলে গেছে। পদ্মা সামনে দাঁড়িয়ে।

থাম হাতে দাঁড়ানো চারজন হতচকিত। বাকি লোকেরাও চোখ বড় বড় করে দেখছে।

পদ্মার চেহারা ঠিক মরা মানুষের মতো বিবর্ণ লাগছিলো যেন কোন কাঠের গায়ে ফুটো করে দেওয়া হয়েছে।

ওর চোখ পাথরের মতো নিষ্প্রাণ। ওর মনে হলো ছেলে চারটে পোলটা দিয়ে ওকে মারতে আসছে। পোলটা ওর দিকেই আসছে। ও আর বাঁচতে পারবে না। ও জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলো।

সকলের মনে হলো, পদ্মার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে। কারো সাহসে কুলোচ্ছে না যে এগিয়ে ওকে তুলবে। কিছুক্ষণ পরে ও নিজেই উঠে দাঁড়ালো। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ও সকলের দিকে দেখলো। তারপর ক্ষোভে কাঁপতে কাঁপতে দরজা বন্ধ করে দিলো।

এটা তার পরের দিনের ঘটনা।

ওরা পাঁচ জন বনের মাঝখানে ওদের ঘাঁটিতে বন্দুক চালানো প্র্যাকটিস করছিল। ওরা ক্ষেত থেকে লাউ কেটে নিয়ে এসেছিলো। বার বার গুলি মেরে সেগুলিকে ছরবেছর করে দিচ্ছিলো। এর সাহায্যে ওরা অন্যদের ভয় পাইয়ে রাখে। কাদির বলছিলো, 'বুড়িটা অজ্ঞান না হয়ে, মরে গেলে আমাদের সমস্যা মিটে যেতো।' মজিদ বললো, ' তোমরা যদি বলো তাহলে ওকে আমি এক্ষুনি মেরে ফেলছি। আশপাশে কোথও মাটি চাপা দিয়ে দেবো। কাকপক্ষীও টের পাবে না।'

গনি বললো, 'আমার তো মনে হয় ওকে নিজেদের হাতে না মেরে সেনাদের এলাকায় ছেড়ে এলেই ভালো হবে। ওরা ওকে ওর বাড়ির লোকেরা যেখানে গেছে সেখানে পৌঁছে দেবে।'

'আমরা এতখানি রিস্ক্ কেন নেবো,' আলি এগিয়ে এসে বললো, 'আমার মনে হয় মজিদই ঠিক বলছে। সত্তর-আশি বছরের বুড়ি তো আজ না হয় কাল মরবেই। ওকে মারলেও গুনাহগার হবো না।'

ইয়াসিন এই মতের সমর্থক নয়। ও গাছ থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামলো, বললো, 'ভগবানের যদি মারার ইচ্ছা থাকতো তাহলে এতদিন মেরে ফেলতো। আমরা নিজেদের মাথায় এ পাপ কেন নেবো? আমার মনে হচ্ছে, ও এত ভয় পেয়েছে আর নিজের সন্তানসন্ততি চলে যাওয়ায় এমন শক পেয়েছে যে কিছু দিনের মধ্যে ও

নিজেই মরে যাবে। দেখোনি ও আমাদের দেখার সঙ্গে সঙ্গে কিরকম জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গিয়েছিলো।'

'তুমি ভুলে যাচ্ছো যে ওই বাড়িটা আমাদের পক্ষে কতখানি জরি,' আলি বললো, 'ওই বাড়িটা যদি আমাদের কব্জায় থাকতো তাহলে আফগান মুজাহিদদের আমরা বাঁচাতে পারতাম।' গনি বললো, 'ওই বাড়িটার পেছনে যে ঢাল আছে তা দিয়ে ওরা পালিয়ে যেতে পারতো। ঠিক আছে, ওকে না মেরে আরো কয়েকটা দিন অপেক্ষা করি। তবে এলাকার সব মানুষকে আমাদের বলে দেওয়া দরকার যে, ওর সঙ্গে কেউ যেন কথা না বলে, ওকে যেন কোন জিনিস পৌঁছে না দেওয়া হয়। কিছু দিনের মধ্যে খিদেতেষ্টায় ও নিজেই মরে যাবে।'

তুমি ঠিক বলছো,' মজিদ বললো, 'খাওয়া-দাওয়ার জিনিস না পেলে বাঁচবে কি করে?'

এ কথাও ইয়াসিনের ভালো লাগলো না। বললো, 'এমন কষ্ট দেওয়ার চেয়ে তো ভালো মেরে ফেলা।'

গনি বিরক্তিভরে বললো, 'ইয়াসিন তো প্রত্যেকটা ব্যাপারেই একটা বাধা দিচ্ছে।' কাদির ওর থেকেও বেশি রাগতস্বরে বললো, 'তোমার এই জিহাদে যোগ দেওয়াই উচিত হয় নি, তুই কি জানিস না যে, জিহাদের সময় বহু নিরীহ নিরপরাধ মানুষও মারা পড়ে? আমাদের লক্ষ্য কাশ্মীরকে অধর্মীদের হাত থেকে মুক্ত করা। এমন মহান এক লক্ষ্যের সামনে এক অসুস্থ বুড়ির গুরুত্ব কি? তার প্রাণের দামই বা কি?'

কাদিরের উত্তেজনামূলক কথা শুনে মজিদ আরো সংযম হারিয়ে ঘোষণা করলো, 'ইয়াসিনের কথায় আমাদের কান দেওয়ার দরকার নেই। আমি এক্ষুনি গিয়ে সব বাড়িতে আর দোকানে বলে দিচ্ছি যে, ওই বুড়ি পন্ডিতানীকে যেন কেউ সাহায্য না করে।'

বাকি সকলের চোখেমুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ।

ইয়াসিনের মুখে হতাশায় ছায়া।

ভাতের মাড় উথলে পড়তেই পদ্মার চমক ভাঙলো। উনুনের ওপর থেকে হাঁড়ি নামিয়ে মাড় গেলে থালায় ভাত ঢাললো। ওর মনে পড়লো, ও কেমন নাতি-নাতনীদের ভাত ঢেলে ঢেলে দিতো। তারা কেমন 'আগে আমাকে, আগে আমাকে' বলে হৈহল্লা করতো। ও একজনের পাতে দিলে আরেকজন সেটা ছো মেরে তুলে নিতো। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-মারামারি লাগিয়ে দিতো। আজ ওর কাছে কেউ নেই। ও একা। এত একা যে নিজেকেই একটা ভূতের মতো মনে হচ্ছে। ভাতের দলাটা কতক্ষণ ওর মুখে আটকে রইলো কে জানে।

মসজিদ থেকে বেরিয়ে গুলাম রসুল বাজারের দিকে পা বাড়ালো। ওর গতিতে বেশ তেজ ছিলো। পায়ে দৃঢ়তা ছিলো। আজকের নামাজের পর ও দৃঢ় মন নিয়ে বাইরে বেরিয়েছে। ও ভেবে নিয়েছে যে, ওর মন যা চায় তাই করবে। ও জানে যে মুদি দোকানদার সামাদ জু সৎ ও ধর্মভী মানুষ। সে ওর কথা ঠিকই শুনবে।

রাতে ওর ঘুম আসে নি। অন্ধকারে ও ছাতের দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে থেকেছে। ঝিঁঝির একটানা আওয়াজ ওর কানে আসছিলো। নিজের প্রিয় বন্ধু বৃজনাথের স্ত্রী পদ্মা ভাবীকে নিয়ে ভাবছিলো। ওর মনে উদয় হলো, তার কয়লা আছে তো, নাহলে এই শীতে জমে যাবে। চাল, চা, নুন এসব কোথা থেকে জোগাড় করবে ওই হতভাগিনী! কেউ ওর কথা ভাবছে না। সবাই ওই গুন্ডাগুলোকে ভয় পায়। ও স্থির করেছে কিছু দরকারি জিনিস পদ্মাকে পৌঁছে দেবে।

সামাদ জু-র দোকানে এসে ও সব জিনিসই অল্প অল্প কিনলো। সেগুলোকে একটা পুঁটলিতে বেঁধে সামাদ জুকে বললো, 'এটা পন্ডিতানীকে দিয়ে আয়।'

সামাদ জু-র রঙ সাদা হয়ে গেলো। ও চারপাশটা দেখে আশ্বস্ত হলো। এই মুহূর্তে ধারে-কাছে কেউ নেই। ও ভয় পাওয়া গলায় বললো, 'খাজা সাহেব, আপনি আমাকে মারতে চাইছেন কেন?'

'ভগবানের রসুলের দিব্যি সামাদ জু, যাও দিয়ে এসো। কেউ কিছু বললে বলবে আমি বলেছি। আমি এখন আর মরতে ভয় পাই না। আমি তোমার দোকান দেখছি। যাও তোমার এই সৎ কাজের জন্য ভগবান আশীর্বাদ করবে।' সামাদ জু-র মনে হলো, কাজটা না করলে তার পাপ হবে। পুঁটলিটা তুলে ও ভয়ে ভয়ে পা বাড়ালো। ও কিছুটা এগিয়ে দূর থেকেই মজিদকে দেখতে পেলো। ওর হাতে বন্দুক। তাকে এড়িয়ে এগোতে গিয়ে ও ধরা পড়ে গেলো।

'আবে এই! তোমার হাতে এটা কি?

' তেমন কিছু না, কয়েকটা জিনিস।'

' ও দিকে।'

' ও দিকে কোথায়?'

' পন্ডিতদের বাড়িতে।'

' তোমার মাথা খারাপ হয়ে যায় নি তো? তোমার নিজের প্রাণের চিন্তা আছে কি নেই? তোমাকে কি বলা হয়েছিলো?'

সামাদ জু-র জিভ শুকিয়ে গেলো। ওর মুখ দিয়ে কথা বেরোতে পারছে না। মজিদ ওকে এক ধাক্কা দিয়ে ওখান থেকে তাড়িয়ে দিলো।

সেই সময় পদ্মা ঘরের মধ্যে সামোভার গরম করছিলো। ফুঁ দিতে দিতে ওর দম শেষ হয়ে গেছে। কয়লার আগুন কিছুটা ওঠার পর ও চায়ের প্যাকেট তুলে দেখলো চা শেষ। ও হতাশায় খালি চায়ের প্যাকেট ছুঁড়ে ফেললো। চা ছাড়া কি ভাবে থাকবে ও ? এরকম করে কদিন আর চলবে? ওর চোখে জল এসে গেলো।

ডাকপিওন সাইকেলে করে পদ্মার বাড়ির দিকে যাচ্ছিলো। গলির মাথায় পৌঁছে ও সাইকেল থেকে নেমে পড়লো। সেই সময় সামাদ জু-র দোকানে দুধওয়ালা রমজান দাঁড়িয়ে ছিলো আর তার সঙ্গে ফূর্তিবাজ আমিন বাটও ছিলো। ডাকপিওনকে দেখে আমিন বলে উঠলো, ' পোস্টম্যান সাহেব! সালাম আলেকুম! আজ কার নামে পরোয়ানা নিয়ে এসেছেন?

'আপনার নয়।'

'আমাকে আর কে লিখবে! আমি তো এমনি এমনি জিজ্ঞেস করলাম যে কে সে ভাগ্যবান যাকে কেউ স্মরণ করেছে?'

' সোমনাথের মা পদ্মার চিঠি, সোমনাথই হয়তো লিখেছে।'

সবাই একে অপরের মুখের দিকে তাকালো।

ঠিক সেই সময় সামাদ জু দেখতে পেলো তিনটে ছেলে ও দিকে আসছে। ও এগিয়ে এসে ডাকপিওনকে বললো, 'ওই দেখো ছেলেরা আসছে। তুমি তাড়াতাড়ি চলে যাও নাহলে ওরা সব চিঠি কেড়ে নেবে।'

ডাকপিওন আলি, গনি আর কাদিরকে আসতে দেখে ঘাবড়ে গেলো। সে পদ্মার নাম লেখা খামটা সমাদ জু-র হাতে দিয়ে বললো, 'ওরা পন্ডিতানীর কাছে চিঠি পৌঁছতে দেবে না। তুমি তাকে দিয়ে দিও। আমি যাচ্ছি।'

সামাদ জু ওই খামখানা খুব দ্রুত নিজের গদির নিচে লুকিয়ে ফেললো। কাদির, গনি আর আলি ওখানে পৌঁছেই সামাদ জুকে ঘিরে ধরলো। ওদের হাতে বন্দুক -

'ডাকপিওন কার চিঠি দিয়ে গেলো?'
'আমার ভাইয়ের চিঠি।
' দেখাও'।
সামাদ জু এক পাশে পড়ে থাকা ভাইয়ের চিঠি তুলে দেখিয়ে দিলো।
'দিল্লি থেকে এসেছে।'
'হ্যাঁ'।
' সেখানে কি করে?'
'একটা হোটেলের খানসামা।'
'গত সপ্তাহেও ওর চিঠি এসেছিলো।'
'ও তো নিয়মিত লেখে। গত সপ্তাহে যে চিঠি এসেছিলো সেটাও দেখে নাও।' আরো একটা চিঠি বার করে দেখিয়ে দিলো। কাদির হুকুমের গলায় বললো, 'কান খুলে শুনে নাও, যে আমাদের সঙ্গে চালাকি করবে, তার খোদা হাফিজ হয়ে যাবে।' এই কথা বলে ওরা তিনজন যার যার রাইফেল সামলাতে সামলাতে ওখান থেকে চলে গেলো।
ওরা দূরে মোড় অবধি যেতে আমিন বাট নিজের ছড়িটা দিয়ে নিজের হাতে মেরে বললো, 'এরা কি দারোগা নাকি যে কার চিঠি এসেছে আর কার চিঠি আসে নি ওদের জানাতে হবে! গুন্ডাগুলো একেবারে মগের মুল্লুক বানিয়ে ফেলেছে।'
'জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে,' রমজান বললো, 'এরা আমাদের হুকুম দেয়, কোন অধিকারে?'
সামাদ জু দুজনকে থামালো, 'রয়ে সয়ে, আজকাল এসব কথা হাওয়ায় উড়ে পৌঁছে যায়। ভগবানের দয়ায় বেচারী পন্ডিতানী ছেলে-বৌ-নাতিনাতনীদের কুশল সংবাদ পেয়ে যাবে।'
'এই চিঠি ওকে কে পৌঁছে দেবে?' রমজান জিজ্ঞেস করলো।
সামাদ জু ধীরে ধীরে বললো, 'রাতের বেলা গোপনে আমি ওর জানালা দিয়ে চিঠিটা গলিয়ে দিয়ে আসবো।'
আমিন বললো, 'যদি ওই মাথা মোটারা জানতে পারে তাহলে তোমার দোকানে আগুন লাগিয়ে দেবে।'
'ওদের বাপের রাজত্ব?' সামাদ জু রেগে বললো। তক্ষুনি ও দেখতে পেলো গুলাম রসুল গলি থেকে বেরিয়ে আসছে। ওকে দেখে তিনজনেই চিন্তা করতে লাগলো পদ্মার চিঠির ব্যাপারটা ওকে বলবে কি না।
'কি ব্যাপার আমাকে দেখতে পেয়েই তোমরা চুপ করে গেলে কেন? অমন করে কি দেখছো?' গুলাম রসুল ওদের কাছে আসতে আসতে বললো। সামাদ জু বলে দিলো, সোমনাথ তার মায়ের নামে চিঠি পাঠিয়েছে। আমিন বললো, 'আমরা বলছি যে সোমনাথের চিঠি এসেছে । এটাও তো হতে পারে অন্য কেউ লিখেছে।'
'আমাকে চিঠিটা দেখাও তো,' গুলাম রসুল বললো। সামাদ জু চিঠিটা বার করে গুলাম রসুলকে দিলো। গুলাম রসুল খুব যত্ন করে খামটা খোলার চেষ্টা করলো যাতে ছিঁড়ে না যায়। চিঠি বার করতে করতে বললো, 'পন্ডিতানী তো নিজে পড়তেও পারে না। ওকে পড়েই বলতে হবে। কি কালই যে পড়লো, অন্যের চিঠিও খুলতে হচ্ছে। তোবা! তোবা! হে প্রভু আমাকে ক্ষমা কোরো।'
সে চিঠি পড়তে লাগলো।
হঠাৎ গুলাম রসুলের হাত কাঁপতে শু করলো। হাতে ধরা চিঠিটাও। ওর চোখ জলে ভরে গেছে। সে সামাদ জু-র দিকে চিঠিটা ছুঁড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আপন মনে বক বক করতে থাকলো, 'না, না, এ চিঠি ওকে আমি পড়ে শোনাতে পারবো না। এ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ঈশ্বর তুমি আমাকে কণা করো, এ তুমি কি করলে!'

গুলাম রসুল দু পা এগিয়ে ফের ফিরে এলো। ওদেরকে বললো, ' তোমরাও এই চিঠি নিয়ে পন্ডিতানীর কাছে যেও না। হতভাগিনী মরে যাবে! খামটা বন্ধ করে দাও। কি দুর্ভাগ্য নিয়েই না ও জন্মেছে! আমরা নিপায় মানুষেরা ওর জন্য কিছুই করতে পারছি না। হায় আল্লা, দয়া করো, দয়া করো।' এই বলতে বলতে বেসামাল পদক্ষেপে সে নিজের বাড়ির দিকে চলে গেলো। সামাদ জু, আমিন বাট আর রমজানও পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ওর যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলো। ওরা কিছুই বুঝতে পারছিলো না। সামাদ জু চিঠিটা হাতে তুলে নিলো।

পদ্মার দম বন্ধ হয়ে আসছিলো। সে কখনও জানালার কাছ যায়, কখনও দরজার কাছে। সে খোলা হাওয়ায় বেরোতে চায়। বুক ভরে নিশ্বাস নিতে চায়। দূরের বরফে ঢাকা উঁচু পাহাড় দেখতে চায়। গাছের মাথা দোলানো, তার সঙ্গে মেঘের জাপটা-জাপটি ও দেখতে চায়। হাওয়ার ধাক্কা নিজের শরীরে অনুভব করতে চায়। কিন্তু ওর মন বিষাদক্লিষ্ট। দরজার শেকলের দিকে হাত বাড়িয়েও সরিয়ে নেয়। ওর মনে হচ্ছে, এই দমবন্ধ অবস্থার মধ্যে ও মরে যাবে।
হঠাৎ ওর চোখে পড়লো উনুনের পেছনে এক ধারে প্লাস্টিকের একটা বড় ঠোঙা পড়ে আছে। ব্যাপারটা কি বুঝতে না পেরে ও চটপট এগিয়ে এসে সেটা ওঠালো। দেখলো, তার মধ্যে খানিকটা চাল, কিছু কয়লা, চায়ের একটা প্যাকেট আর নুনের একটা প্যাকেট রয়েছে। উনুনের পেছন দিকের ছোট জানালার পাল্লা খোলা। ও বুঝতে পারলো কেউ ওর প্রতি দয়া দেখিয়ে ওই সব জিনিস ছুঁড়ে দিয়েছে। কিন্তু এমন হৃদয়বান মানুষ কে হতে পারে? সোমনাথের বন্ধু ডাক্তার বসির আহমদ হতে পারে। তার স্ত্রী সুফিয়া হতে পারে। কিন্তু না, ওদের ছেলে ইয়াসিন কোনমতেই ওদের এ কাজ করতে দেবে না। তাহলে আর কে হতে পারে? গুলাম রসুল? হ্যাঁ, হতে পারে। বেচারী এ সব এখানে ছুঁড়ে দেওয়ার সময় কতই না ভয় পেয়েছে! পদ্মার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এলো। ঠিক সেই সময় গুলি চলার শব্দ ভেসে এলো। সে দ্রুত পায়ে গিয়ে জানালার পাল্লা বন্ধ করে দিলো।
বাইরে তখন সত্যি সত্যি ক্রশ ফায়ারিং চলছিলো। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সেনারা এগোচ্ছিলো। তারা গনিকে ধরতে চায়। গনি এবং অন্যান্য ছেলেরা জবাবী গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পিছনে সরে যাচ্ছিলো। ওদের লক্ষ্য গ্রামের পেছন দিকের ঢাল বেয়ে নেমে যাওয়া, তাহলে সেনারা ওদের টিকির নাগাল পাবে না। গনিকে আর ধরতে পারবে না। কিন্তু বন অবধি পৌঁছতে পৌঁছতে সেনাদের ছোঁড়া একটা গুলি ইয়াসিনের কাঁধ জখম করে দিলো।
সেনারা যখন দেখলো সব কজন সন্ত্রাসবাদীই জঙ্গলে লুকিয়েছে তখন তারা ফিরে গেলো। ওরা জানে গনিকে এখন আর ধরা যাবে না।
ওদিকে ছেলেগুলো ইয়াসিনকে কোনরকমে গোপন ঘাঁটিতে নিয়ে এলো। তাকে জল খাওয়ালো। আঘাতের জায়গায় ওষুধ লাগিয়ে বেঁধে দিলো। ওষুধও খাইয়ে দিলো। তারপর যে যার এদিক ওদিক শুয়ে পড়লো। ওরা সবাই ক্লান্ত। আজ প্রাণের দায়ে ওদের একটু বেশিই দৌড়তে হয়েছে।
সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে নেমেছে।
ইয়াসিন বললো, 'গনি, এই জন্যই তোমাকে আমি সব সময় বলি, বাঁচিয়ে চলো।'

' সেনারা আমাকে কোনদিন ধরতে পারবে না।' গনি জবাব দিলো।
কাদির কাছেই শুয়ে ছিলো। সে উঠে নিজের টুপি ঠিক করতে করতে বললো, 'আজ যদি আমাদের সাথে আফগানী মুজাহিদরা থাকতো তাহলে আমরা ওই সেনাদের জঙ্গলের মধ্যে ঘিরে মেরে ফেলতাম।'
'এবারে আমরা মুজাহিদদের তখনি আসতে বলবো যখন তাদের থাকার কোন ব্যবস্থা করতে পারবো।' ইয়াসিন বললো। আলি বললো, 'অনেক হয়েছে। আমার কথা শোনো। ওই বুড়িকে আজই নিকেশ করে দেই। মুজাহিদদের জন্য ওই বাড়ির চেয়ে ভালো জায়গা আর হতেই পারে না।'
মজিদ উৎসাহভরে উঠে দাঁড়ালো, 'আমি এক্ষুনি ওকে জাহান্নমে পাঠিয়ে দিয়ে আসছি।'
গনি বেশ ভাবুকের ভাঙ্গিতে বললো, 'আমারও মনে হচ্ছে, ওর মৃত্যুর সময় হয়ে গেছে।'
আলি উঠে দাঁড়ালো, 'চলো, এক্ষুনি যাই।'
সঙ্গীদের কথাবার্তা ইয়াসিন সহ্য করতে পারছিলো না কিন্তু ও বুঝতে পারছে যে, এই মুহূর্তে ওর কথা কেউ শুনতে চাইবে না। তা সত্ত্বেও সে চুপ করে থাকতে পারলো না, 'শোনো, আরেকবার ভালো করে ভেবে নাও।'
মজিদ বললো, ' তোমার কথা আর আমরা মানবো না। তুমি এখানে থাকো। আমরা এই পুণ্য করে আসছি।' সবাই পা বাড়ালো। কাদির ইয়াসিনকে বললো, ' তোমার ঘা এখনও তাজা, তুমি বাড়ি চলে যাও।'
ইয়াসিন উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো, 'না। চলো, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাবো।' সে-ও বাকিদের পিছন পিছন পা বাড়ালো।
দূর থেকে ভেসে আসা একটা কুকুরের কান্নার মতো ডাক অন্ধকার চিরে গভীর খাদের মধ্যে পড়ছে। গ্রাম শুয়ে পড়েছে। ঢালে, পায়ে চলা পথের ওপর পড়ে থাকা বড় বড় পাথর শ্বাস বন্ধ করে রয়েছে। ওরা আশঙ্কায় চুপসে রয়েছে। ঘরে ঘরে লেপ আর কম্বলের তলায় ঢুকে থাকা মানুষগুলো জেগে রয়েছে। তাদের বুকের ভেতরে অস্বস্তির বৃশ্চিক দংশন। কেউ সামান্য নড়াচড়াও করছে না। সকলেই দুশ্চিন্তায় কুঁকড়ে রয়েছে। এক্ষুনি কেউ দরজায় ধাক্কা দেবে আর তাদের চোখের সামনে তাদের প্রাণ ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাবে।
রাইফেল কাঁধে নিয়ে ওরা পাঁচ জন বসতি এলাকার গলিতে পৌঁছে স্রোতস্বিনী নালী পেরিয়ে ভুট্টার খেতের মধ্য দিয়ে পন্ডিতদের বাড়িতে এসে দরজার সামনে দাঁড়ালো।
' দরজা ভেঙে ফেলছি।' মজিদ বললো। আলি বোঝালো, 'মহল্লার লোকেরা জেগে যাবে।' ইয়াসিন বললো, 'মহল্লার লোকেরা জেগে গেলে আমরা কিছুই করতে পারবো না।' মজিদ নিজের গলার আওয়াজ নিচু রাখার চেষ্টা করতে করতে বললো, 'কার এত সাহস যে আমাদের আটকাবে? যে এগিয়ে আসবে তাকেই গুলি করে দেবো।'
কাদির এগিয়ে এলো, 'এত সব করার দরকার নেই। আমি জানালার শিক ভেঙে ফেলছি। সেখান দিয়ে গলে গিয়ে দরজাও খুলে দিচ্ছি।'
'পন্ডিতানী যদি হল্লা করে?'
' সেই মুহূর্তে আমি ওর গলা টিপে দেবো।' কাদির উত্তর দিলো। সে জানালার দিকে গিয়ে এক এক করে জানালার পাঁচটা শিকই ভেঙে ফেললো। তারপর চুপিসাড়ে ও ভেতরে লাফিয়ে নামলো।
এক কোণায় পদ্মা কাঁথা মুড়ি দিয়ে গুটিসুটি মেরে ছিলো। ওর কাতরানির চাপা আওয়াজ শোনা যাচ্ছিলো। কাদির এক মুহূর্ত ওকে লক্ষ্য করলো, তারপর দরজার কাছে গিয়ে শেকল খুলে দিলো। বাকি চার জন ভেতরে ঢুকলো। ওরা এগিয়ে এসে পদ্মাকে দেখলো, তার কাতরানির শব্দ শুনলো। ইয়াসিন বললো, 'মনে হচ্ছে অসুস্থ।'
কাদির এগিয়ে পদ্মার পাশে বসলো। সে কি যেন বিড় বিড় করে বলছে। কাদির ওর মুখের কাছে কান নিয়ে শুনে বললো, 'জল চাইছে।'
এক পাশে পড়ে থাকা একটা জগ থেকে একটা গেলাসে জল ভরে পদ্মার পাশে গিয়ে বসলো। তার মুখে একটু জল দিলো। তার কপালে হাত দিয়ে দেখলো। বললো, 'এর তো ভীষণ জ্বর।' আলি, গনি আর ইয়াসিন ও দিকেই তাকিয়ে ছিলো। আলি আস্তে আস্তে বললো, 'ভালোই হয়েছে অসুস্থ হয়ে। এখন যদি একে আমরা মেরে ফেলি তাহলে এ কষ্টের হাত থেকে রেহাই পাবে আর আমাদেরও পুণ্য হবে।'
ইয়াসিন তীব্র গতিতে ওর কাছে এসে বললো, 'এক অসুস্থ নিপায় বুড়িকে মেরে পুণ্য কামাতে চাও?'
আমরা তো একে মারতেই এখানে এসেছি,' গনি বললো। মজিদ বন্দুক তুলে বললো, 'একটা গুলিতেই এর দফা রফা হয়ে যাবে।' কাদির হাত বাড়িয়ে ওর বন্দুক নিচে নামিয়ে দিতে দিতে বললো, 'আমার মনে হয় এ নিজেই মরে যাবে।'
'আমিও তাই চাই।' ইয়াসিন বললো, 'আমার কথা তোমরা বুঝতে চেষ্টা করো। এই অবস্থায় একে মারলে পাপ হবে। আল্লাও তোমাকে ক্ষমা করবে না। কাদির ঠিক বলছে। এর বাঁচার সম্ভাবনা নেই। কালকে এ নিজেই মরে যাবে। আমাদের কাজও হবে আর আমরা পাপের হাত থেকেও বেঁচে যাবো।'
আলি ইয়াসিনের ওপর ঝাঁজিয়ে উঠলো, 'তুমি সবসময় কাপুষের মতো কথা বলো।'
'আঘাত কিন্তু আমারই লাগে।' ও নিজের কাঁধের দিকে ইঙ্গিত করে বললো, 'তবু তুমি আমাকে কাপুষ বলছো!'
পদ্মা এবার জোরে আওয়াজ করে কাতরে উঠলো। কাদির তার দিকে তাকিয়ে বললো, ' বোধহয় আরো জল চাইছে। আমি দিচ্ছি।' সে পদ্মার দিকে এগোতেই মজিদ রেগেমেগে বললো, 'তুই ওকে এমনি করে জল খাওয়াতে থাকলে ও আর মরবে কি করে। চল এখান থেকে চলে যাই।'
'না, আমি জল দিয়ে আসছি,' বলে কাদির জগ তুললো কিন্তু মজিদের হুমকি শুনে থমকে গেলো - 'খবরদার, তুই যদি ওকে জল দিস তাহলে' - মজিদ বন্দুক তুলে ধরেছে।
সকলে একে অপরের দিকে দেখছে।
কাদির সেখানেই জগটা নামিয়ে রেখে বাইরে বেরিয়ে গেলো। বাকি সকলে ওর পিছন পিছন পা বাড়ালো।
ডাক্তার বসির আহমদ শুয়ে ছিলো, ঘুমোয় নি। ও বুঝতে পারছিলো, ওর স্ত্রীও ঘুমোয় নি। কিন্তু কেউ কোন কথা বলছে না। ছোরা ঘুমোচ্ছে। বাইরের দরজা তবু খোলা ছিলো। ইয়াসিন তখনও ফেরে নি। ও এলে ভালো, না এলেও ঠিক। ওকে নিয়ে এখন আর চিন্তা করে লাভ নেই। সবই ভগবানের হাতে।
প্রথমে দরজা খোলার, পরে বন্ধ করার আওয়াজ কানে এলো। সে বুঝতে পারলো ইয়াসিন এসেছে। সুফিয়া নিঃশব্দে উঠে রান্নাঘরে গিয়ে খাবার সাজাতে লাগলো। ইয়াসিন খেতে বসলো। ডাক্তার বসিরও চোখ ডলতে ডলতে ধীর গতিতে সেখানে এসে বসলো। ইয়াসিন তার জখম কাঁধ ওভারকোটে আলো ঢাকলো। সে নিঃশব্দে খেতে লাগলো।
'কি ব্যাপার আজ যে তুই খুব চুপচাপ?' ডাক্তার বসির জিজ্ঞেস করলো, 'ক্রশ ফায়ারিংয়ে কেউ জখম হয় নিতো?'
'না।'

সুফিয়া জিজ্ঞেস করলো, 'আজ এত দেরি হলো? কোথায় ছিলি?'
'আজ আমরা সোমনাথের মা পন্ডিতানীকে মারতে গিয়েছিলাম।'
ডাক্তার বসির আর সুফিয়া আঁতকে উঠলো। সুফিয়া আর্তকণ্ঠে বললো, ' তোরা সবাই জাহান্নামে যাবি।'
ডাক্তার বসিরও আর্তস্বরে বললো, 'ইয়াসিন, আমি কোনদিনও ভাবি নি যে তুই আমার বন্ধুর মাকেও-'
'আগে সব শুনুন। আমরা ওখানে পৌঁছে দেখলাম সে নিজেই মরে যাবে।'
'ওর কি হয়েছে?' ওরা দুজন ঘাবড়ে জিজ্ঞেস করলো।
'খুব বেশি জ্বর উঠেছে ওর। আমরা ওকে জল খাইয়ে চলে এসেছি।'
'আমি ওকে দেখে আসছি। ওষুধও খাইয়ে আসবো।' এই বলে ডাক্তার উঠতে লাগলো।
'আপনি যাবেন না। মজিদরা দেখে ফেললে-'
কিন্তু ডাক্তারকে আটকানো গেলো না। সে নিজের ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। সুফিয়া ইয়াসিনকে বললো, 'তুই ওর পেছন পেছন যা। নজর রাখিস।'
ডাক্তার বসির পদ্মার বাড়িতে ঢোকার আগে এদিক ওদিক দেখলো কেউ দেখছে কি না। তারপর সুড়ুৎ করে ভেতরে ঢুকে গেলো। ও টের পেলো না গলির মাথায় একটা দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়ানো ইয়াসিন ওর ওপর নজর রাখছে। ভেতরে ঢুকে সে দরজা বন্ধ করে পদ্মার দিকে তাকালো। পদ্মা অস্থির, কাতরাচ্ছে। ডাক্তার এমন লজ্জা বোধ করলো যা ওকে ভেতরে ভেতরে কুড়ে কুড়ে খেতে লাগলো। সে ধীর পায়ে সামনে এগিয়ে পদ্মার পাশে বসে পড়লো। তার কপালে হাত রাখলো। পদ্মা চোখ দুটো খুললো। জানাচেনা হাত । সে অপলকে ডাক্তারকে দেখতে লাগলো।
'কি হয়েছে মৌজি?' ডাক্তার কান্নাভেজা গলায় আন্তরিক স্বরে জিজ্ঞেস করলো।
' মৌজি বলছো আর এত দিন পরে আমার খবর নিতে এসেছো? একবার এসে খোঁজ নিলি না হতভাগিনী মৌজি একা একা কি করছে? হ্যাঁরে তুই তো সোমনাথের পণের বন্ধু !' পদ্মার অভিযোগে ডাক্তার বসিরের হৃদয় খান্‌খান্ হয়ে গেলো। পদ্মা বলে যাচ্ছিলো, ' তোর মনে আছে তোর কথায় একবার আমি সোমনাথকে কি মারটাই না মেরেছিলাম?'
ডাক্তারের চোখে জল এসে গেলো। গলাবন্ধের আস্তিনে চোখ মুছতে মুছতে সে বললো, 'ব্যাস, মৌজি আর বলো না। আমি সত্যিই দোষ করেছি। কিন্তু এমন বিষে তো সব নীল হয়ে গেছে। আমরা সবাই জানুয়ার হয়ে গেছি। কি করবো? কিন্তু আমি তোমার কোন ক্ষতি হতে দেব না। নাও, এই ওষুধটা খেয়ে নাও। সকাল হওয়ার আগেই জ্বর কমে যাবে।' সে ব্যাগ থেকে ওষুধ বার করতে লাগলো।
'না রে বসির, আমি ওষুধ খাব না। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মরে যেতে চাই। একা একা আর আমি থাকতে পারছি না। নাতি - নাতনীদের ছেড়ে আর বেঁচে থেকে কি লাভ! জানিনা সোমনাথ বাচ্ছাদের নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিনা!'
'ওরা যেখানেই থাকুক ভগবান ওদের সঙ্গে আছে। নাও, তুমি ওষুধ খাও।'
'না রে আমি খাবো না।'
'আমি তো তোমাকে না খাইয়ে যাবো না। দাঁড়াও একটু জল নিয়ে আসি।' ও জগ থেকে একটা গেলাসে জল ঢেলে বললো, 'ওষুধ খেতে না চাওয়া তোমার পুরনো অভ্যেস মৌজি। আমি কি জানি না ওষুধ না খাওয়ার জন্য তুমি কতরকম বাহানা করতে পারো? কিন্তু আজ আর তোমার কোন বাহানাই আমি শুনবো না। নাও, মুখ খোল।' পদ্মা ওর হাত সরিয়ে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললো, ' দ্যাখ বসির, আমার ওপর জোরজবরদস্তি করিস না। আমি বাঁচতেই চাই না তো ওষুধ খেয়ে কি করবো? তোর ওষুধ নিয়ে তুই যা। আমাকে আমার ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দে।'
' দ্যাখো মৌজি, ওষুধ তোমাকে খেতেই হবে। নাহলে সোমনাথের কাছে আমি মুখ দেখাবো কি করে?'
' সোমনাথ কোথায় এখানে যে সে তোকে কিছু জিজ্ঞেস করবে?'
' ও এখানে নেই বলেই তো আমার দায়িত্ব আরও বেড়ে গেছে। ওষুধ না খাইয়ে আমি কিছুতেই যাবো না।'
' তোর যা খুশি কর। আমি খাবো না।' এই বলে পদ্মা মুখ ঘুরিয়ে নিলো। ডাক্তার কেঁদে ফেললো। ফোঁস ফোঁস করতে করতে বললো, ' আমি তোমার পায়ে পড়ছি মৌজি। আমাকে আর লজ্জা দিও না। আমার মাথার দিব্যি, ওষুধ খেয়ে নাও।' ডাক্তার হাত বাড়িয়ে ওর মুখে ওষুধ ঢেলে দিলো। ওর মুখে জলের গেলাসও ধরলো। পদ্মা ওষুধ খেয়ে নিলো। ডাক্তার চোখের জল মুছতে লাগলো।
পদ্মার চোখও ভরে এসেছিলো।
ডাক্তার উঠতে উঠতে বললো, 'আমি কাল আবার আসবো। তুমি ঘাবড়ে যেও না। আমি ঠিক আসবো।' ও দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া অবধি পদ্মা সে দিকে তাকিয়ে রইলো।
পরের দিন যা হবার নয় তাই হলো।
আলি, গনি আর মজিদ ভুট্টার ক্ষেতের কাছে টিনের ঘরের বাইরে বসে নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কার করছিলো। ওই চালাঘর যে পন্ডিত পরিবার ওই ক্ষেতের মালিক ছিলো তাদের। তারা গতবছর এখান থেকে পালিয়ে গেছে। অস্ত্র সাফ করতে করতে ওরা ট্রানজিসটার মারফত হিন্দুস্থানী নিউজ বুলেটিন শুনছিলো। পাঞ্জাবে শিখ জঙ্গীদের কার্যকলাপ বেড়ে গেছে শুনে ওরা খুব খুশি। কাল রাতে তারা একটা যাত্রী ভর্তি বাস ধ্বংস করেছে। হঠাৎই গনি ইয়াসিনের মা সুফিয়াকে চুপি চুপি পদ্মার বাড়ির দিকে যেতে দেখলো। ওর সন্দেহ হল। ও পিছন পিছন এগোলো। সুফিয়া ওকে পিছনে আসতে দেখে দৌড় দিলো। এবারে ওদের তিনজনের স্থির বিশ্বাস হল যে, ও পদ্মার কাছেই যাচ্ছে। ওরা তিনজনেই ওর পিছন পিছন দৌড়লো। সুফিয়া ভাঙা জানালা দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে জানালা বন্ধ করে দিলো। ততক্ষণে ওরা তিন জনেও সেখানে হাজির।
ওরা দরজার কড়া নাড়লো। ঘরের ভেতর সুফিয়া তাড়াতাড়ি 'ফিরনের' পকেট থেকে ওষুধের শিশি বার করে পদ্মাকে ওষুধ খাওয়াতে লাগলো। পদ্মা আগের মতেই অশক্ত। দরজার কড়া নাড়ার শব্দ ক্রমাগত ভেসে আসছে। সুফিয়া ওষুধ খাওয়ানো শেষ করে দরজা খুলে দিলো, 'কি ব্যাপার?' সে জিজ্ঞেস করলো। আলি ধমকের সুরে বললে, 'আমাদের কাছে না বলে কয়ে আপনি এ বাড়িতে ঢুকেছেন কেন?'
'পন্ডিতানী অসুস্থ। ওকে ওষুধ খাওয়ানো দরকার ছিলো।'
'আমরা ঠিক করেছি ওকে কেউ ওষুধ দেবে না।'
' কিসের ঠিক করা! আমি তোমাদের ফয়সালা মানি না।'
ওরা বুঝতে পারলো না এরপর কি বলবে। এ তো আর কেউ নয়, ইয়াসিনের মা। তক্ষুনি সুফিয়া দেখতে পেলো আরও কয়েকজন মহিলা আসছে। সেদিকে ইশারা করে বললো, 'ওই দেখো, ওরাও আসছে। তোমরা কতজনকে আটকাবে?'

ওরা তিনজন দেখলো আজিজী, নুরা, খাতুন প্রমুখ মহিলারা সেদিকেই আসছে। খাতুন কাদিরের মাসি। সে দরজা ওবধি পৌঁছে মজিদের বন্দুকের নলটা হাত দিয়ে সরিয়ে দিলো। বাকি মহিলারা নির্দ্বিধায় ওদের সামনে দিয়ে এগিয়ে গেলো।

সুফিয়া দরজা বন্ধ করে দিলো। ওরা তিনজন নিঃশব্দে ওই জায়গা ছেড়ে চলে গেলো।

মহিলারা সকলে পদ্মাকে ঘিরে বসলো। পদ্মা শুয়ে রইলো। তার ওঠার ক্ষমতা নেই। খাতুন তার হাতে হাত রেখে বললো, 'মাসি, আমাদের লজ্জার শেষ নেই। এত দিনের মধ্যে একবার তোমাকে দেখতে আসি নি।' আজিজী পদ্মার আরেকটা হাত নিজের হাতে ধরে বললো, 'আমাদের ছেলেগুলো চরমে পৌঁছেছে। চারিদিকে অ াতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে। বাড়ি থেকে বেরোনোই মুশকিল।'

'আমরা সবাই ভয়ে মরছি চাচী,' নুরা বললো ' তোমার কথা মনে আসে নি তা নয় কিন্তু নিজের প্রাণের ভয় তো সকলেরই আছে।'

ওদের কথা শুনে পদ্মার চোখে জল এসে গেল। সে বললো, 'আমিও এবার টের পেলাম জীবনের ভয় কি! আগে আমি বলতাম কবে এই জীবন থেকে ছুটি পাবে া।' সুফিয়া আবদারের স্বরে বললো, 'আমরা তোমাকে কিছুতেই মরতে দেব না আম্মা!'

'আমার তো মনে হচ্ছে মৃত্যু কি আমি দেখে ফেলেছি,' চোখের জল মুছতে মুছতে পদ্মা বললো। খাতুন বললো, 'একা থাকার জন্য অমন লেগেছে। তুমিও যদি ছেলে - বউ আর নাতি - নাতনীর সঙ্গে চলে যেতে তো ঠিক হতো।'

'আমি ভাবলাম, বিদেশে গিয়ে মরবো কেন? নিজের বাড়িতেই মরবো। কিন্তু যখন একা একা প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিলো তখন ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। প্রাণ ত্যাগ করাও সহজ কাজ নয়।'

' সোমনাথ ভাইয়ের কোন খবর পাওয়া গেছে?' নূরা জিজ্ঞেস করলো।

আজিজীর হঠাৎই কিছু মনে পড়লো। সে বললো,' আমি শুনেছি তোমার নামে একটা চিঠি এসেছে কিন্তু লোকেরা সেটা তোমায় দিতে দেয় নি।'

'কি বললে?' পদ্মা হুড়মুড়িয়ে উঠে বসলো, 'আমার নামে চিঠি এসেছে? কার কাছে রয়েছে সেই চিঠি? কেন আমাকে দেয় নি?'

'সামাদ জু দোকানদারকে ডাকপিওন দিয়ে গেছে। আমি তেমনই শুনেছি।' বলতে বলতে আজিজী নিজের ভুল বুঝতে পারলো।

'আমি এক্ষুনি ওর কাছ থেকে চিঠি নিয়ে আসছি। কোন সাহসে ও হতচ্ছাড়া আমার চিঠি নিজের কাছে রেখে দিয়েছে?' এই কথা বলতে বলতে পদ্মা উঠে দাঁড়ালে া। তারপর দ্রুত পায়ে বাইরের দিকে এগোলো। মহিলারা ওকে থামাবার চেষ্টা করলো।

'মাসি, তুমি অসুস্থ। পড়ে যাবে।'

'না রে আমার কিছু হবে না।'

'চাচী, তুমি যেও না। আমি সামাদ জু কে ডেকে পাঠাচ্ছি।'

'না, আমি নিজেই যাবো। ওকে জিজ্ঞেস করবো ও কেন আমার চিঠি চেপে রেখেছে?'

মহিলারা ওকে আটকাতে পারলো না। ও দৌড় লাগালো।

ওর বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে গলির মাথায় যেখানে ভুট্টা খেতের কাছে টিনের ঘরটা ছিলো সেখানে মজিদ, গনি আর কাদির দাঁড়িয়ে ছিলো। পদ্মাকে খালি প ায়ে পাগলের মতো দৌড়তে দেখে ওরা অবাক হলো। পদ্মা ওদের দেখতে না পাওয়ার ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেলো। কিছুটা দূরে গিয়ে ও দাঁড়িয়ে পড়লো। ওই মুহূর্তে ওর বোধ হয় না যে, ওরাই সন্ত্রাসবাদী। সে ওদের কাছে দৌড়ে ফিরে এসে শিশুর সারল্যে বললো, 'সামাদ জু-র কাছে আমার চিঠি এসেছে। সোমনাথের চিঠি নিজের কাছে ও রেখেছে কেন?' এই বলে সে ফের বাজারের দিকে দৌড় লাগালো।

ওদের তিনজনের মাথায় কিছুই ঢুকলো না। ওরা হতচকিত হয়ে ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলো।

চড়াইয়ে চড়তে চড়তে ও টাল সামলাতে পারছিলো না। হাঁপাচ্ছিলো। ও সমাদ জু-র দোকানে পৌঁছে হাঁ করে হাঁপাতে হাঁপাতেই দাণ চেঁচামেচি শু করে দিলো, 'আম ার চিঠি কোথায়? দে আমাকে, তাড়াতাড়ি দে।'

সামাদ জু-র হাতের দাঁড়িপাল্লা যেমন কে তেমন ধরা রইলো। সে শঙ্কার চোখে পদ্মার দিকে চেয়ে রইলো। রমজান আর আমিন বাটও সেখানে ছিলো। তারা হড়বড় করে উঠে দাঁড়ালো। ওরা জানে চিঠিতে কি লেখা আছে। সকলেরই হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এলো।

পদ্মা একটুও না থেমে বলে যাচ্ছে, 'আমার সোমনাথের লেখা চিঠি তুই আমাকে দিস নি কেন? তোর এত সাহস এল কোথা থেকে যে তুই চিঠি চেপে রেখেছিস? তুই এরকম ছোটলোক? আমার মুখের দিকে কি দেখছিস? দে আমার চিঠি।'

সকলে পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে। সামাদ জু ধীরে ধীরে দাঁড়িপাল্লা এক দিকে রেখে গদির তলা থেকে চিঠি বের করে ওর দিকে এগিয়ে দিলো। পদ্মা ঝটপট খাম ছিঁড়ে চিঠির অক্ষরগুলো চোখের সামনে ধরলো। কিন্তু ও পড়বে কি করে? পড়তে পারে না। সামাদ জু কে বললো, 'তুই-ই পড়ে শোনা। আমি তো পড়তে পারি ন া।'

সামাদ জু ইতস্তত করে চিঠিটা নিয়ে নিলো। চিঠিটা উর্দুতে লেখা। সে ধীর স্বরে পড়তে আরম্ভ করলো, 'শ্রদ্ধেয়া মাসিজি, আমি আপনার স্নেহের রাজনাথ। জম্মু থেকে চিঠি লিখছি।' সামাদ জু চিঠি পড়তে পড়তে থেমে গিয়ে বললো, 'এটা সোমনাথের নয়, রাজনাথের চিঠি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, রাজনাথ আমার বৌমার ভাই। তুই পড়।'

সামাদ জু কাঁপা স্বরে আবার পড়তে লাগলো, 'আমরা সকলে উপত্যকা থেকে কি ভাবে বেরিয়ে এসেছি আর কি ভাবে এখানে পৌঁছেছি সে আর বলার নয়। বিপদের পর বিপদ এসেছে। সোমনাথ আর আমি দুজনে মিলে যতদূর সম্ভব পরিস্থিতির সামাল দিয়েছি, কিন্তু কি যে বলবো......... কিভাবে যে বলবো......নিদাণ শীতে রাস্তার ধারে শোওয়ার ফলে সোমনাথের নিউমোনিয়া হয়ে গিয়েছিলো.....' সামাদ জু এটুকুই পড়তে পারলো।

এর চেয়ে বেশি পড়া ওর পক্ষে অসম্ভব হয়ে গেলো। পদ্মা ওর দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে ছিলো। সামাদ জু বিবর্ণ হয়ে গেছে। সে কণ চোখে পদ্মার দিকে তাকালো।

'কি রে, তুই চুপ করে গেলি কেন, কি ব্যাপার? ওখানে শীতের মধ্যে রাস্তার ধারে শোওয়ার জন্য সোমনাথের নিউমোনিয়া হয়ে গেছে? এখন ও কেমন আছে? সুস্থ হয়েছে?' পদ্মার সত্তর বছরের অভিজ্ঞ চোখ যা অনুমান করেছে, মন সেটা মানতে রাজি নয়। ও আরো কিছু জানতে চায়। চিঠিতে যা লেখা আছে তা-ই শুনতে চায়। সামাদ জু-র পায়ের ওপর দিয়ে যেন সাপ যাচ্ছে। রমজান আর আমিন বাটের চোখেমুখেও ঘাবড়ানো ভাব। পদ্মা অস্থিরভাবে বললো, 'কি ব্যাপার সামাদ জু? তুই সাড়াশব্দ করছিস না কেন? আমার কথার জবাব দিচ্ছিস না কেন? সোমনাথ ভালো আছে তো?' পদ্মার মন এখন আর বাগ মানছে না। যা বলতে পারছে না সেটাই এখন স্বীকার করতে চাইছে। ভ্রম কেটে যাচ্ছে। চরম অসহায়তায় ও চিৎকার করে উঠলো, 'তুই চিঠি পড়ছিস না কেন? দে আমাকে।' ওর কাছ থেকে চিঠি ছিনিয়ে নিয়ে সে আমিন বাটের দিকে ঘুরলো, ' নে ভাই, তুই-ই পড়ে শোনা। মনে হচ্ছে ওর মুখে তালা লেগেছে।' কিন্তু আমিন বাটেরও চিঠিটা হাতে নেওয় ার সাহস হলো না। ও বড় বড় চোখে তাকিয়েই রইলো। এবারে পদ্মার ভেতরে উথালপাথাল হলো। ঠিক সেই সময় সে গুলাম রসুলকে আসতে দেখলো। সে ত ার দিকে দৌড়লো। গুলাম রসুলের রক্ত হিম হয়ে গেলো। এতদনি যে সত্যের মুখোমুখি হতে না চেয়ে ও নিজের কাছেই পালিয়ে বেড়াচ্ছিলো সে আজ ওকে চৌর

াস্তার মোড়ে ধরে ফেলেছে। ও জানে চিঠিতে কি লেখা আছে। সে খবর পদ্মার সামনে পড়ে শোনাবার মতো বুকের পাটা ওর নেই। চিঠিখানা হাতে নিয়ে ও পদ্মাকে দেখতে লাগলো। ওর চোখের সামনে অন্ধকার নেমে আসতে লাগলো। পদ্মা তীব্র চিৎকার করে উঠলো, 'কেন আমাকে পড়ে শোনাচ্ছো না? তোমার কি হলো?' গুলাম রসুলের চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে এলো। এতে পদ্মা আরো ধৈর্য হারিয়ে ফেললো, 'আমার দিকে কি দেখছো? চিঠি পড়ে শোনাও ওতে কি লেখা আছে?'

গুলাম রসুল কাঁদতে লাগলো। ভাঙা ভাঙা স্বরে বললো, 'ভাবী, সর্বনাশ হয়ে গেছে, সব শেষ হয়ে গেছে।'

পদ্মার যেন প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাচ্ছে। ও চিৎকার করে উঠলো, 'কি হয়েছে গুলাম রসুল, কি এমন ঘটেছে?'

'কি বলবো! আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। কি করে বলি! সোমনাথ নিউমোনিয়ার হাত থেকে রেহাই পায় নি। তাকে ভগবান টেনে নিয়েছে।'

শুনেই পদ্মা জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লো। সামাদ জু এবং অন্যান্যরা ওকে সামলাতে এগিয়ে গেলো। গুলাম রসুল তখনও কেঁদে চলেছে।

মজিদ দৌড়ে দৌড়ে নিজেদের গোপন আস্তানার দিকে যাচ্ছে। আলি দূর থেকে ওকে দেখতে পেয়ে পিস্তল চালানোর প্র্যাকটিস থামিয়ে দিলো। ওকে থামতে দেখে সকলেই থেমে গেলো। মজিদ কাছাকাছি পৌঁছতেই গনি জিজ্ঞেস করলো, 'কি হয়েছে?'

'খুব ভালো খবর আছে।' মজিদ দম সামলাবার চেষ্টা করতে করতে বললো, 'বুড়ি পন্ডিতানীকে আর কেউ বাঁচাতে পারবে না। ও যদি আজ মরে যায় তাহলে আমরা আজই ওর বাড়ির দখল নিতে পারবো।'

আলি খুশি হয়ে বললো, 'প্রথম থেকেই বোঝা যাচ্ছিলো। ও অত জ্বরের ধাক্কা সামলাতে পারবে না।'

'আরে ব্যাপারটা তা নয়।' মজিদ বললো, 'সকালে আমরা দেখলাম না ও চিঠি নিতে সামাদ জু-র ওদিকে যাচ্ছিলো। ওই চিঠিতে খবর এসেছে ওর ছেলে সোমনাথ নিউমোনিয়ায় মারা গেছে।'

'কি হয়েছে?' ইয়াসিন শক পেয়ে উঠে দাঁড়ালো।

'হ্যাঁ, আমাকে রমজান বলেছে। ছেলের মৃত্যুর খবর শুনেই জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেছে। সবাই মিলে ওকে তুলে ওর বাড়িতে নিয়ে গেছে। তোর বাবা ইনজেকশন দিয়ে জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করে যাচ্ছে। কয়েক ঘন্টা হয়ে গেছে এখনও ওর জ্ঞান ফেরে নি।'

ইয়াসিন দুশ্চিন্তিত ভাবে এক পাশে সরে গেলো। সকলে ওর দিকে তাকিয়ে।

' তোমার তো খুশি হওয়ার কথা।' গনি বললো।

ইয়াসিন ভাবুক ভঙ্গিতে বললো, ' আমরা যা করছি আমাদের মাতৃভূমির জন্য নয়, আমরা ইসলামের জন্য করছি। আমরা মুজাহিদ।'

ইয়াসিনও উত্তেজিতভাবে জবাব দিলো, 'ইসলামে কোথায় লেখা আছে যে পাড়াপড়শী একজন অসুস্থ নিপায় বুড়িকে মেরে ফেলো। ওর পরিবারের কোন লোক তো ইসলামের বিদ্ধে একটি কথাও বলে নি। কী অসহায়ভাবে সোমনাথ মারা যায় তাহলে ভগবান আমাদের মাফ করবে না। ওর মৃত্যুর দায় আমাদের ওপরই বর্তাবে। কারণ আমরাই ওর ছেলেকে এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য করেছি। আমাদের অন্তর কুঁরে কুঁরে খাবে।' ইয়াসিনের মনে যন্ত্রণা। মজিদ ওর কথা শুনে নিজেকে ধরে রাখতে পারছিলো না। ও হুমকির সুরে বললো, 'এ কথা তো আর নতুন কিছু নয় ইয়াসিন। শু থেকেই তুমি এ রকম কাপুয়ের মতো কথা বার্তা বলো আসছো। যখনই আমাদের কোন পরিকল্পনা সাফল্যের মুখ দেখতে শু করে তখনই তুমি আমাদের পেছন থেকে টেনে ধরো। এখন থেকে আমরা আর তোমার কোন কথাই শুনবো না।'

ইয়াসিনও রেগে গিয়ে বললো, 'আমারও তোমাদের সঙ্গে থাকার কোন দরকার নেই। তোমরা যাকে বাহাদুরি বলছো সেটা আসলে অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা। আমি তোমাদের এমন কাজকর্মে থাকতে চাই না। তোমাদের মতো পথভ্রষ্ট লোকদের সাথে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। আমি যাচ্ছি। আমি প্রার্থনা করবো যাতে বুড়ির প্রাণ বাঁচে।' এই বলে সে ওখান থেকে হাঁটা দিলো। বাকি সবাই কি করবে ভেবে পাচ্ছিলো না।

গনি বললো, 'ইয়াসিনকে আমাদের হাতছাড়া হতে দেওয়া যায় না' আলি বললো, 'ও যদি অন্য কোন গোষ্ঠীতে যোগ দেয় তাহলে আমাদের সংগঠন জোর ধাক্কা খাবে। আমার মনে হয় ওকে থামানো উচিত। ও তো তেমন আপত্তিকর কিছুই বলে নি। আমাদেরও মানবিকতা ত্যাগ করা উচিত নয়।'

মজিদ দাঁত খিঁচিয়ে বললো, 'তুই ওকে সমর্থন করিস না। তাহলে তোরও লাশ নামিয়ে দেবো।'

গনি বললো, 'তুমি দেখছি পাগল হয়ে গেছো।'

কিছুক্ষণ বাদে ওরা সকলে ইয়াসিন যেদিকে গেছে সেদিকে বেরিয়ে পড়লো।

পদ্মার বাড়িগক সঙ্কুচতি, ভীত হয়ে দম বন্ধ করে রয়েছে। পদ্মার হাঁপ চলছে। ডাক্তার ওর পাশে এমনভাবে বসে ছিলো যেমন ডুবন্ত নৌকার মাঝি বসে থাকে। সুফিয়া আর খাতুন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। গুলাম রসুল এক ধারে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে মনে মনে দুই ভুবনের মালিকের কাছে ক্ষমা প্রর্থনা করছিলো। পদ্মা বিড় বিড় করে বলছিলো, 'আমার সোমনাথের শরীর বরাবরই নরম-সরম। আমি ওকে দাণ আদর-যত্নে মানুষ করেছি। বসির, এই ভয়ানক শীতে ও রাস্তার ধারে শুয়ে কি কষ্টই না পেয়েছে! নিউমোনিয়ায় দাণ কষ্ট হয়। তুই তো জানিস সামান্য কষ্টেই ও কি রকম কাবু হয়ে পড়তো। ওখানে ওকে সবরকম কষ্টই সহ্য করতে হয়েছে। ছোটরা ঘাবড়ে যাবে ভেবেছে। নিজের সন্তানদের ওপর ওর খুব টান ছিলো। তাদের জন্য ও নিজের সব কষ্ট নীরবে সহ্য করেছে নিশ্চয়ই। ও শেষ বারের মতো চোখ বন্ধ করার আগে নিশ্চয়ই আমার কথা ভেবেছে। কিন্তু আমি তো কিছুই জানতে পারি নি। উলটে ভেবেছি আমি মরলে সোমনাথ খুব দুঃখ পাবে। ও কি কখনও ভেবেছে যে ওর মৃত্যুতে আমার কি অবস্থা হবে? আমি আর বাঁচতে চাই না রে বসির! আমার আর দম ফেলার ক্ষমতা নেই। আমি যেতে চাই। আমি এখান থেকে বিদায় নিতে চাই।' এই কথা বলতে বলতে ও চোখ বুজলো।

ডাক্তার বসির আহমদ কাঁদতে লাগলো। পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলারাও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। গুলাম রসুল হাত দুটো উপরে তুলে কলমা পড়তে লাগলো। বাইরে অনেক মানুষ বসে ছিলো। কয়েকজন দাঁড়িয়েও ছিলো। কেউই বুঝতে পারে নি যে পদ্মা এ পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গেছে। তারা ভাবছিলো, ডাক্তার ওকে ওষুধ দিচ্ছে। তাদের মধ্যে আজিজী, নূরা ও সলমাও ছিলো। একদিকে পুষেরা ছিলো। তাদের মধে রমজান আর আমিন বাট ছিলো। কিছু দূরে ফিরনের মধে কাংড়ি নিয়ে সামাদ জু বসে ছিলো। সবার মুখে দুঃখের ছায়া।

ওখানে এদের বসে থাকার আরো একটা কারণ আছে। দু-তিন বছর ধরে গ্রামের মস্তান ছেলেগুলো যা বলতো ওরা তাই করেছে। ওদের অনেক কথাবার্তার সমর্থনও ওরা করতো। হিন্দুস্থানী সেনাদের ওরা ঘৃণা করে। তবু প্রতিমুহূর্তে ছেলেগুলোর ধমকি আর চাপের মধ্যে থাকতে ওদের ভালো লাগে না। অনেক ব্যাপারেই তাদের কাজ-কারবার ওদের খারাপ লাগে। এই মুহূর্তে ওদের তাই মনে হচ্ছিলো যে, ওরা নিজেদের মর্জি মতো চলতে পারে। পদ্মা পন্ডিতানীর বাড়ির বাইরে বসে থাকতে থাকতে ওরা নিজেদের ওই ছেলেগুলোর হাত থেকে মুক্ত মনে করছিলো। নিজেদের হারিয়ে ফেলা অস্তিত্ব ওরা নতুন করে অনুভব করতে পারছে।

দূরে গলির মাথায় ইয়াসিনকে আসতে দেখে সকলে তার দিকে দেখতে লাগলো। সে চুপচাপ সামাদ জু যেখানে বসে ছিলো সেখানে এসে দাঁড়ালো। তাকে পাশে এসে দাঁড়াতে দেখে সামাদ জু ফিরনের ভেতর কাংড়িটা আরো চেপে ধরে ধীরে ধীরে অন্য পাশে সরে যেতে থাকলো।

দরজা খোলার আওয়াজ শুনে সকলেই সেদিকে তাকালো। ডাক্তার বসির আহমদ বেরিয়ে আসছে। সে চোখের জল মুছছে। তার মুখ থেকে সামান্য আর্ত শব্দও বেরিয়ে এলো। সবাই বুঝলো পদ্মা মারা গেছে। আজিজী, নূরা এবং অন্যান্য মেয়েরা জোরে জোরে কাঁদতে লাগলো। সামাদ জু-র হাত থেকে কাংড়ি নিচে পড়ে গেলো। রমজান আর আমিন বাটের চোখেও জল।

সবচেয়ে বেশি আঘাত লাগলো ইয়াসিনের। সে পাথরের মতো নিষ্প্রাণ হয়ে তার পিতার কান্নার দিকে তাকিয়ে ছিলো।

ডাক্তার হঠাৎ চোখের ওপর থেকে হাত সরাতেই ইয়াসিনকে দেখতে পেলো। তার চোখে আগুন জ্বলে উঠলো। শরীর কাঁপতে লাগলো। সে ইয়াসিনের দিকে এগে ালো।

ইয়াসিন তার উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেও নিজের জায়গা থেকে নড়লো না। ওর কাছে পৌঁছেই ডাক্তার তার গালে কষে এমন এক চড় মারলো যে সে ছিটকে মুখ থুবড়ে পড়লো। ও যেখানে পড়লো সেখানে তক্ষুনি কাদির, গনি, আলি আর মজিদ এসে দাঁড়িয়েছে। মজিদ বুদ্ধি খুইয়ে রাইফেল তুললো, আলি পিস্তলে হাত র াখলো কিন্তু কাদির আর গনি ওদের দুজনকে আটকে দিলো।

ডাক্তার আবার এগিয়ে ইয়াসিনকে লাথি ঘুষি মারতে লাগলো। সে ওকে গালিও দিলো, 'শয়তানের বাচ্চা, খুনি, বাদমাশ! আমি তোকে মেরেই ফেলবো। তোরা সব জানোয়ার হয়ে গেছিস, তোরা জাহান্নমে যাবি। তোদের দেখলে ঘেন্না হয়।'

ওর সঙ্গীরা যে দিকে দাঁড়িয়ে ছিলো ইয়াসিন মার খেতে খেতে সেদিকে পিছু হটছে আর ডাক্তার মারতে মারতে গালাগাল দিতে দিতে এগিয়ে যাচ্ছে। তবু ডাক্তার চেষ্টা করছিলো নিজেকে সংযত রাখতে।

মহিলারা কান্না ভুলে গিয়ে একে ওপরকে জড়িয়ে রয়েছে।

রমজান, সামাদ জু আর আমিন বাটও একে অপরের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। গুলাম রসুল বাড়ির বাইরে এসে ওই দৃশ্য দেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ডাক্তারকে থামাতে থামাতে বললো, 'ব্যস, ব্যস, অনেক হয়েছে। ওকে ছেড়ে দাও। মাথা খারাপ করো না। এই ছেলেগুলোর বুদ্ধিনাশ হয়েছে, এখন তুমি আর সংযম হারিও ন া।'

ডাক্তার মারা বন্ধ করে নিজের আস্তিনে চোখ মুছতে মুছতে বললো, 'চাচা, এরা আমার মাকে মেরে ফেলেছে।'

'তুমি জানো ওর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক ছিলো। ওর স্বামী আমার প্রাণের বন্ধু ছিলো। ও আমার মায়ের পেটের বোনের চেয়েও বেশি ছিলো। আমি জানাজানির ভয়ে আশঙ্কায় চুপি চুপি ওর ঘরে চা, চাল, কয়লা আর নুন ফেলে দিয়ে এসেছি। রসুলে পাক-এর দিব্যি, কোন মুখ নিয়ে জগৎ সংসারের পালনকর্তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবো?'

ইয়াসিন মুখের রক্ত পুঁছছিলো। ওর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্যরাও ওদের দুজনের কথা শুনছিলো।

সামাদ জু বললো, 'আমি চিঠিটা না দিলে আম্মা হয়তো আরো কদিন বাঁচতো।'

'সবাই ভগবানের হাতে,' রমজান বললো, 'এতে তোমার কোন দোষ নেই।'

'আম্মার সৎকারের কি হবে?' আমিন বাটের কথা শুনে সকলে নড়েচড়ে উঠলো।

রমজান বললো, 'এখন তো যা কিছু করার আমাদেরই করতে হবে।'

'কিন্তু যা-ই করা হোক হিন্দু রীতিতে করতে হবে।' ডাক্তার বসির এ কথা বলে ওদের কাছে এসে দাঁড়ালো।

'হিন্দু রীতি কি এখানে কেউ জানে?' আমিন বাট জিজ্ঞেস করলো।

'আমার তো মনে হয় চুপচাপ কবরখানায় নিয়ে কবর দিলেই ভালো।' রমজানের কথা শুনে গুলাম রসুল দপ্ করে জ্বলে উঠলো, 'গাগল হয়েছো না কি? যে মুসলমান নয় তাকে মুসলমানের মতো কবর দেবে? নির্বোধ! ওর ধর্ম নষ্ট করলে তোমার ধর্মও বাঁচবে না।'

সবাই নীরব হয়ে গেলো। জটিল সমস্যা। সবাই তা নিয়ে ভাবতে লাগলো। একটু পরে ডাক্তার বললো, 'এখন তো অনেক দূর দূর গ্রামেও কোন হিন্দু নেই।'

সামাদ জু পরামর্শ দিলো, 'যদি হিন্দুস্থানী সেনা এ ধারে আসে তাহলে আম্মার দেহ তাদের হাতে তুলে দেওয়া যায়।' গুলাম রসুল বললো, 'যদি অপেক্ষা করি ত াহলেও তো ঠিক নেই ওরা কবে এখানে আসবে। আমাদের শিগগিরই কিছু করতে হবে।'

'কিন্তু চাচা শান অবধি নিয়ে যাওয়ার জন্যও তো..........কি যেন বলে ওদের........শবযাত্রী.........হ্যাঁ হ্যাঁ শবযাত্রী দরকার। ওকে কে সাজাবে? আমি তো যাত্রার অ াগেই সাজাতে দেখেছি।'

খাতুন এগিয়ে এসে ধীর আওয়াজে বললো, 'হিন্দুদের মধ্যে মৃতদেহকে ধোয়ানো হয়।'

'তুই জানলি কি করে?' গুলাম রসুল জিজ্ঞেস করলো। খাতুন সে কথার কোন জবাব দিলো না। গুলাম রসুল আবার বললো, 'যদি ধোয়াতেই হয় তাহলে কে জ ানে কেমন ভাবে ধোয়াতে হয়? তার পরে কি পরানো হয়? আমরা তো কোন আচার-অনুষ্ঠানই জানি না। ইয়া আল্লা, আমাদের দয়া করো, কোন পাপ যেন আম াদের না লাগে।'

'কোনদিন ভাবিনি এমন সিচুয়েশন হবে।' ডাক্তার বললো।

সকলেই এমনই ভাবনা ভাবছিলো। প্রত্যেকেই নিজেদের অজ্ঞানতা অনুভব করছিলো। ইয়াসিন আর ছেলেরাও একটা সমাধান বার করার জন্য চেষ্টা করছে। গনি এগিয়ে এসে বললো, 'বনের পরে যে নালা আছে তার ওপারে একটা জিলার ওপর একটা মন্দির আছে। কিছু দিন আগে এক বুড়ো পুতকে আমি ওখানে দেখেছি। আমার হাতে রাইফেল ছিলো বলে সে ভয় পেয়েছিলো। আমার ধারণা সে এখনও আছ। যদি ওকে আমরা ধরে নিয়ে আসি তাহলে সে যেমন বলবে সেইভাবে আমরা লাশ টা নিকেশ করে দিতে পারি।'

'আগে ঠিক করে কথা বল।' ডাক্তার জ্বলে উঠলো, 'আমাদের কাজ লাশ নিকেশ করা নয়, মর্যাদার সঙ্গে সৎকার করা।'

গনি মাথা নিচু করলো। নিজের দোষ বুঝেছে।

গুলাম রসুল ডাক্তারকে বললো, ' ছেলেটাতো ঠিকই বলেছে।' তার পর সে গনির দিকে তাকিয়ে বললো, 'যাও, তোমরা পন্ডিতকে ডেকে আনো। ওর সঙ্গে সভ্য ম ানুষের মতো ব্যবহার করবে। রোয়াব দেখিও না। যাও ওকে তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো। ততক্ষণ আমরা এই সৎ ও পবিত্র আত্মার শবদেহ ঠিকঠাক অবস্থায় রাখার চেষ্টা করি। এ কাজে সকলেরই ভাগ নিতে হবে।'

ডাক্তারও ওই পাঁচজনকে বললো, 'তাড়াতাড়ি যাও আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে এসো।'

ওরা সবাই বেরিয়ে গেলো। ওদের মধ্যে ইয়াসিনও ছিলো। ওর মুখ থেকে তখনও রক্ত বেরোচ্ছিলো আর ও মুছছিলো।

ভুট্টার ক্ষেতের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে ওরা যখন নাশপাতি বাগানের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে তখন কাদির ইয়াসিনকে বললো, ' তোর বাবা তোকে এমন পেটালো আর তুই চুপ করে মার খেয়ে গেলি?'
'কি করবো?'
'আর কিছু না হোক পালিয়ে তো যেতে পারতি!'
'আমি চাইছিলাম উনি আমাকে আরো মান।'
' কেন?'
' আমার জন্যই পন্ডিতানী মারা গেছে। আমার অনুতাপের শেষ নেই। মার খেয়ে তবু মনের ভার খানিকটা কমেছে।' মজিদ রেগেগিয়ে ওর গলা টিপে ধরে বললো, 'তুই এরকম কথা বললে তোকে আমি জানে মেরে ফেলবো।' ইয়াসিন ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে দিতে বললো, 'তুই ভালো করেই জানিস আমি জানের পরোয়া করি না।'
আলি মেজাজের সঙ্গে প্রশ্ন করলো, 'তুই কি ভাবছিস আমরা যে জিহাদ করছি তা ভুল?'
গনি ফোড়ন কাটলো, 'যুদ্ধে সবই ন্যায়সঙ্গত।'
'এটা কোন যুদ্ধ নয়, এটা জিহাদ আর জিহাদে পাপ করা যায় না।' ইয়াসিন জবাব দিলো।
' ঠিক আছে, আমাদের যদি কোন পাপ হয়েই থাকে তাহলে বুড়িটার সৎকার করে চলো তার থেকে মুক্ত হই।' মজিদ নিজেকে এবং অন্যদেরও আশ্বাস দিলো। কেউই আর কথা বাড়ালো না। সকলেই নিজ নিজ ধর্মব্রত আপন অন্তরে যাচাই করছে। ইয়াসিন নীরবতা ভেঙে বললো, 'তাড়াতানি পা চালাও নাহলে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যাবে।'
সবাই গতি বাড়ালো।
পুরোহিতকে তার পরিবারের লোকেরা সঙ্গে নিয়ে যায় নি। সে নিপায় হয়ে ওখানে ছিলো। সে সারাক্ষণ 'শিবশম্ভু'র সামনে হাত জোড় করে, মাথা ঠুকে ঠুকে, গেয়ে গেয়ে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করে যেন সন্ত্রাসবাদীরা তাকে মেরে না ফেলে। ও মন্দিরের লাগোয়া ছোট একটা ঘরে ভয়ে ভয়ে থাকতো।
সে ভয়ে ভয়ে ঘরের পেছনে গেলো। ফুল তুলবে। দূরে ওই পাঁচজনকে রাইফেল হতে আসতে দেখে ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেলো। সে দৌড়ে ঘরে ঢুকে পড়লো। ওই পাঁচজনও তাকে দৌড়ে ঘরে ঢুকতে দেখেছে।
মন্দিরের বাইরে প্রাচীরের দরজায় ওরা দাঁড়ালো। মুসলমান বলে ওরা ভেতরে ঢুকতে ইতস্তত করছে। কিন্তু ওদের ফেরার তাড়া ছিলো। মজিদ হাঁক দিলো, 'পুতমশাই, ভয় পাবেন না। আমরা আপনাকে কিছু বলবো না। আপনি বাইরে এসে আমাদের কথা শুনুন।'
ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে পুরোহিত থর থর করে কাঁপছে।
আলি আর ধৈর্য রাখতে পারলো না - 'আপনি যদি বেরিয়ে না আসেন তাহলে আমাদেরই ভেতরে ঢুকতে হবে।'
ইয়াসিন দরজা খুলে উঠোনে ঢুকে পড়লো। সকলেই মন্দিরের চাতালে উঠে শিবলিঙ্গের পাশ দিয়ে ঢুকে গেলো। সকলে তার পেছন পেছন পুরোহিতের ঘরে ঢুকে পড়লো।
ইয়াসিন যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে পুরোহিতকে সব ঘটনা জানিয়ে তাকে ওদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য আবেদন জানালো। পুরোহিত বিক্ষুব্ধ স্বরে বললো, 'আমি তোমাদের সঙ্গে যাবো না। তোমরা যেভাবে খুশি বুড়ির দাহ-সৎকার করতে পারো। ইচ্ছে করলে ওকে কবরও দিতে পারো।' মজিদ পট করে বললো, 'আপনি তো আশ্চর্য কথা বলছেন! ওরকম পাপ আমরা করবো কেন? একজন হিন্দুর লাশকে আমাদের কবরখানায় কবর দিতে যাবো কেন আমরা?'
পুরোহিত তা সত্ত্বেও রাজি না হওয়ায় ওরা সবাই মিলে তাকে চ্যাংদোলা করে তুলে বাইরের দিকে এগোলো। দরজার কাছে পৌঁছতে পুরোহিত চেঁচালো, 'আরে তোমরা আমাকে মন্দিরের দরজাটাতো বন্ধ করতে দাও। আমি যাবো তোমাদের সঙ্গে। আমাকে ছাড়ো।'
ওরা তাকে নামিয়ে দিলো। নিজের 'শিবশম্ভু'-র কাছে পৌঁছে সে কেঁদে কেঁদে বললো 'এ আমাকে আমার কোন জন্মের শাস্তি দিচ্ছো ভোলানাথ? এরা আমাকে খুন করবে। আমাকে রক্ষা করো হে ভগবান।'
ওর কথা শুনে ওরা পাঁচজন মুচকি মুচকি হাসতে লাগলো। পুরোহিত ওদের কাছে ফিরে এসে বললো 'আমার প্রাণ এখন তোমাদের হাতে। তবে একটা কথা বলে রাখি, আমি কিন্তু কোনদিন কারো শবদাহের সৎকার করি নি। তোমরা আমাকেই বেছে নিলে। চলো, যা হওয়ার হবে। পথে কিছু কাঠ জোগাড় করতে হবে মড়া বইবার খাটিয়া বানাবার জন্য।'
ওরা সকলে ওকে ঘিরে চলতে লাগলো। পথে লম্বা কাঠ যতগুলি পেলো তুলে নিলো।
ওরা পল্লীর বাজারে পৌঁছে দেখলো সামাদ জু নিজের দোকানের সামনে ওদেরই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। মৃতদেহ ঢাকার জন্য নতুন সাদা চাদর ওর হাতে। সে পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করলো, 'সৎকারের জন্য যা যা জিনিস লাগবে আমাকে বলুন আমি নিয়ে আসছি।'
পুরোহিত বললো, 'কাঠ তো এরা নিয়ে এসেছে। কয়েকটা দড়ির গোলা নিয়ে এসো আর ঢাকা দেওয়ার জন্য সাদা কাপড়।'
'সেটা আমি নিয়েছি।' সামাদ জু হাতে ধরা চাদরটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আর কি লাগবে বলুন?'
'ধূপধুনো আর সম্ভব হলে একটা হাঁড়ি নিয়ে এসো।'
'ঘি -ও তো লাগবে, না?'
' তোমার ইচ্ছে, নিয়ে এসো। কিন্তু এসব জিনিসের জন্য পয়সা কে দেবে?' ওর ভয়, ওকেই না এই খরচ বইতে হয়।
'পয়সার চিন্তা আপনাকে করতে হবে না পন্ডিতজী। আমরা মরে গেছি না কি? আপনি যান। আমি সব জিনিস নিয়ে আসছি।'
পুরোহিত আর ওরা পাঁচজন গলির ঢালে নামতে লাগলো।
দূর থেকে পুরোহিতকে আসতে দেখে পদ্মার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। 'পন্ডিত পাওয়া গেছে, বলে কলরব উঠলো। 'সরে যাও, এদিকে সরে এসো, রাস্তা ছাড়ো, ওনাকে যেতে দাও'। বলে দরজার কাছে দাঁড়ানো মহিলারা একে অপরকে ধাক্কা দিতে লাগলো।
মহিলাদের মাঝখান দিয়ে পুরোহিত ঘরের ভেতরে ঢুকে গেলো। এক কোণায় অন্ধকারে পড়ে থাকা পদ্মার লাশ দেখে ওর নিজের নিপায় অবস্থা, নিঃসঙ্গতার কথা মনে এলো। যন্ত্রণার ছুরি বিদ্ধ হলো। ওর চোখে জল এসে গেলো। কয়েক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে রইলো। না পেরে অস্থিরভাবে বাইরে এলো। বাইরে পা দেওয়ার আগে চোখ মুছে নিলো। বাইরে বেরিয়ে সে মহিলাদের বললো, 'শবদেহ ধীরে ধীরে সরিয়ে আনো। যে কাপড় পরা আছে সেখানা খুলে ফেলো। খানিকটা জল দেহের ওপর ঢেলে দাও। তারপর অন্য একটা যে কোন কাপড় পরিয়ে দাও। তোমরা এই কাজটা করো ততক্ষণে শব বইবার খাটিয়া তৈরি করাই।'
মহিলারা ভেতরে গেলো। পুরোহিত ওই পাঁচজনকে শববাহী খাটিয়া তৈরী করার কায়দা বলতে লাগলো। ওরা পাঁচজন আনুগত্য ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজে হাত

দিলো। পুরোহিত নির্দেশ দিলো, ‘ বেশ শক্ত করে দড়ি বেঁধো। মরা মানুষের ওজন খুব বেশি।’
ওদের কাছে কাজটা অদ্ভুত লাগছিলো। মজিদ বললো, ‘কখনোও ভেবেছিলি যে এ কাজও করতে হবে?’
‘কথা বন্ধ করে এই দড়িটা টান,’ ইয়াসিন বললো।
‘দ্যাখ, আমি কি রকম কষে এই দড়িটা বেঁধেছি।’ আলি উৎসাহভরে বললো।
পুরোহিত সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে তাগাদা লাগালো, ‘ওই হাঁড়িতে কয়লা ধরিয়ে রাখো আর ধুপকাঠি জ্বালিয়ে দাও।’
কাদির বিরক্তির সুরে বললো, ‘এই পুত দেখি আমাদের ওপর বেশ হুকুম চালিয়ে যাচ্ছে!’
‘তুই বেকার চেল্লামিল্লি করিস না তো!’ গনি ওকে বাধা দিয়ে বললো, ‘এখন এ যা বলছে করে যা।’ইয়াসিন বললো, ‘এই বুড়ির কাছে আমাদের কোন ঋণ শোধ করার ছিলো।’ কাদির হালকা স্বরে বললো, ‘এখন তো মিটে গেলো। এবার মুক্তি।’
পুরোহিত শেষ টান দিয়ে সিগারেটের টুকরোটা এক ধারে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। সে পাশে বসা গুলাম রসুলকে বললো, ‘কাউকে আগে ভাগে শানে পাঠিয়ে দিন। ক ঠ বাছাই করে চিতা সাজাতে হবে।’
অন্দরে পদ্মার শরীর ধোয়া হয়েছে। মহিলারা তাকে একটা শুকনো কাপড় পরাচ্ছে। খাতুন সে দিকে তাকিয়ে বললো, ‘কি সুন্দর দেখাচ্ছে পন্ডিতানীকে’। সুফিয়া ত ার কানে ‘দেয় গয়না’ পরাতে পরাতে বললো, ‘বিয়ের পর আমি যখন এই মহল্লায় আসি তখন এর বয়স ঢলতে শু করেছে, তবু দেখতে সকলের চেয়ে সুন্দর ছিলে া। গানও গাইতো দাণ। আমি বরাবরই একে আমার শাশুড়ি ভাবতাম।’
নূরা বললো, ‘ বেচারীর ভাগ্যটা দ্যাখো। কি অবস্থায় মরতে হলো!’ আজিজী বললো, ‘আমরা কি কখনও ভেবেছিলাম ওর এসব কাজ আমাদেরই করতে হবে?’
দরজায় ধাক্কা পড়লো। সুফিয়া উঠে দরজা খুললো। রমজান দাঁড়িয়ে। সে জিজ্ঞেস করলো, ‘সব কিছু হয়ে গেছে?’
‘হ্যাঁ, সব তৈরী।’ সুফিয়া জবাব দিলো।
ভাঙ্গা দেওয়ালের পাঁচিলে গুলাম রসুল দুই হাতের কনুই দিয়ে ঘাড় চেপে এমন ভাবে বসে ছিলো যেন সে নিজেও পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। নিজের বন্ধু বৃজন াথের কথা তার মনে পড়ছে। ওর চোখের পলক পড়তে চাইছিলো না। কি সুন্দরই না ছিলো সে? তখন খুব বেশি হলে পদ্মার বয়েস চৌদ্দ কি পনেরো!
দরজা খোলার আওয়াজ শুনে ধ্যান ভঙ্গ হলো। সে দেখলো ইয়াসিন আর তার বন্ধুরা পদ্মার লাশ বাইরে বয়ে আনছে। ও দাঁড়িয়ে পড়লো। ডাক্তার এবং অন্যান্যর াও উঠে দাঁড়ালো। পুরোহিত এগিয়ে শববাহী খাটিয়ায় মৃতদেহ কি ভাবে রাখতে হবে তা ছেলেদের বললো; পা কোন দিকে আর মাথা কোন দিকে থাকবে। ত ারপর শবদেহ সাদা কাপড়ে ঢেকে দিয়ে তার ওপর কিছু ফুল ছড়িয়ে দিলে। সঙ্গে এ -ও বলে দিলো খাটিয়া কাঁধের ওপর কেমনভাবে তুলতে হবে।
ছেলেরা খাটিয়া কাঁধে তুলতেই মহিলারা বেসামাল হয়ে কাঁদতে লাগলো। তাদের বিলাপ সন্ধ্যার অন্ধকারকে এমনভাবে চিরতে লাগলো যেমন বনে জোর হাওয়া বইলে দেওদার গাছ কাঁদতে থাকে তেমনি। সকলের বুকে বেদনার পাষাণ, ওই পাঁচজনেরও।
পদ্মার ঘরবাড়িও তাদের আত্মার শেষযাত্রা দেখছিলো...... দূরে, গলি পেরিয়ে ভুট্টার ক্ষেত আর নাশপাতি বাগান অবধি।
শবদেহ চিতায় রাখা হয়ে গেছে।
একটা ছোটখাটো কাঠে কাপড়ের একটা টুকরো বেঁধে পুরোহিত সেটা কেরোসিনে চোবালো। তারপর একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে সেটাতে আগুন লাগ ালো। জড়ো হওয়া সকলের দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, ‘চিতায় আগুন দেবে কে?’
সকলে একে অপরের দিকে তাকিয়ে।
সামাদ জু, রমজান, আমিন বাট, ডাক্তার বসির আহমদ এবং বাকিরা নীরব। এক ধারে দাঁড়ানো ইয়াসিন, কাদির, গনি, আলি আর মজিদও ধৈর্য হারিয়ে এদিক ওদিক দেখছে। কেউই বুঝতে পারছে না এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার কথা কার?
গুলাম রসুল তখনও সেখানে পৌঁছায় নি। বুড়ো শরীরে চড়াই পেরোতে পেরোতে অন্যদের থেকে পিছিয়ে পড়েছে। ইয়াসিন বললো, ‘পুতমশাই, আপনিই চিতায় আগুন দিয়ে দিন না।’
‘না না।’ পুরোহিত তীব্রভাবে বললো, ‘আমি কোনদিন চিতায় আগুন দেই নি। এ কাজ আমি পারবো না।’
সামাদ জু খুব নরমভাবে যুক্তি দিলো, ‘ দেখুন, আমরা সকলেই মুসলমান। একজন হিন্দুর চিতায় আমারা আগুন দিলে সে কি ঠিক হবে?’
‘ কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক তা আমি বলতে পারবো না। আগুন দিতে হলে দাও। অন্ধকার নেমে গেছে। আমি যাচ্ছি। আমাকে মন্দিরে পৌঁছতে হবে।’
কেউই কিছু ভেবে পাচ্ছে না।
গুলাম রসুল তক্ষণে ওখানে হাঁপাতে হাঁপাতে পৌঁছেছে। সে পুরোহিতের কথা শুনতে পেয়েছে তবু ডাক্তার বসির আহমদের কাছে ব্যাপারটা কি জানতে চাইলো। সে এগিয়ে এসে পুরোহিতকে বললো, ‘আমাকে দাও পন্ডিত। আমি আগুন দিচ্ছি। আজ একজন ভাই তার বোনের চিতায় আগুন দেবে।’ পুরোহিত জ্বলন্ত কাঠখান া গুলাম রসুলের হাতে দিয়ে দিলো। তাকে বলেও দিলো আগুন কোথায় আর কিভাবে লাগাতে হবে। গুলাম রসুল কাঁপা কাঁপা হাতে চিতার নিচে যেখানে ঘাসপাতা ছিলো সেখানে জ্বলন্ত কাঠখানা রেখে দিলো। চিতায় সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে গেলো। গুলাম রসুল পিছিয়ে এসে চোখ মুছতে লাগলো।
সবাই খুশি যে কাজটা ভালোয় ভালোয় মিটে যাচ্ছে।
আগুন লেলিহান হয়ে উঠছে। চারিদিকে ছড়িয়ে আগুন এখন উর্ধর্বমুখী।
আচমকা দূর থেকে গুলির আওয়াজ এলো।
সবাই চমকে উঠলো। দূরে নিচে সেনারা জিপ থেকে নামছে।
ইয়াসিন চিৎকার করে উঠলো, ‘গনি, সেনারা আবার তোর পেছনে তাড়া করেছে। তুই এখান থেকে পালা। আমরা ওদের আটকাচ্ছি।’ মজিদ ঘাবড়িয়ে বললো, ‘আগে নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র বার কর।’
বাকি সকলেই অস্ত্র তৈরি হতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।
সেনারা গুলি চালাতে চালাতে এগোচ্ছে।
ওরা পাঁচ জনও নিজেদের অস্ত্র নিয়ে তৈরী। তারা সেনাদের ফায়ারিংয়ের জবাব দিতে শু করলো।
বাঁদিকে ছেলেরা পজিশন নিয়েছে আর ডান দিকে সেনারা। মাঝখানে চিতা জ্বলছে। দুই দিক থেকে ক্রশ ফায়ারিং চলছে।

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com